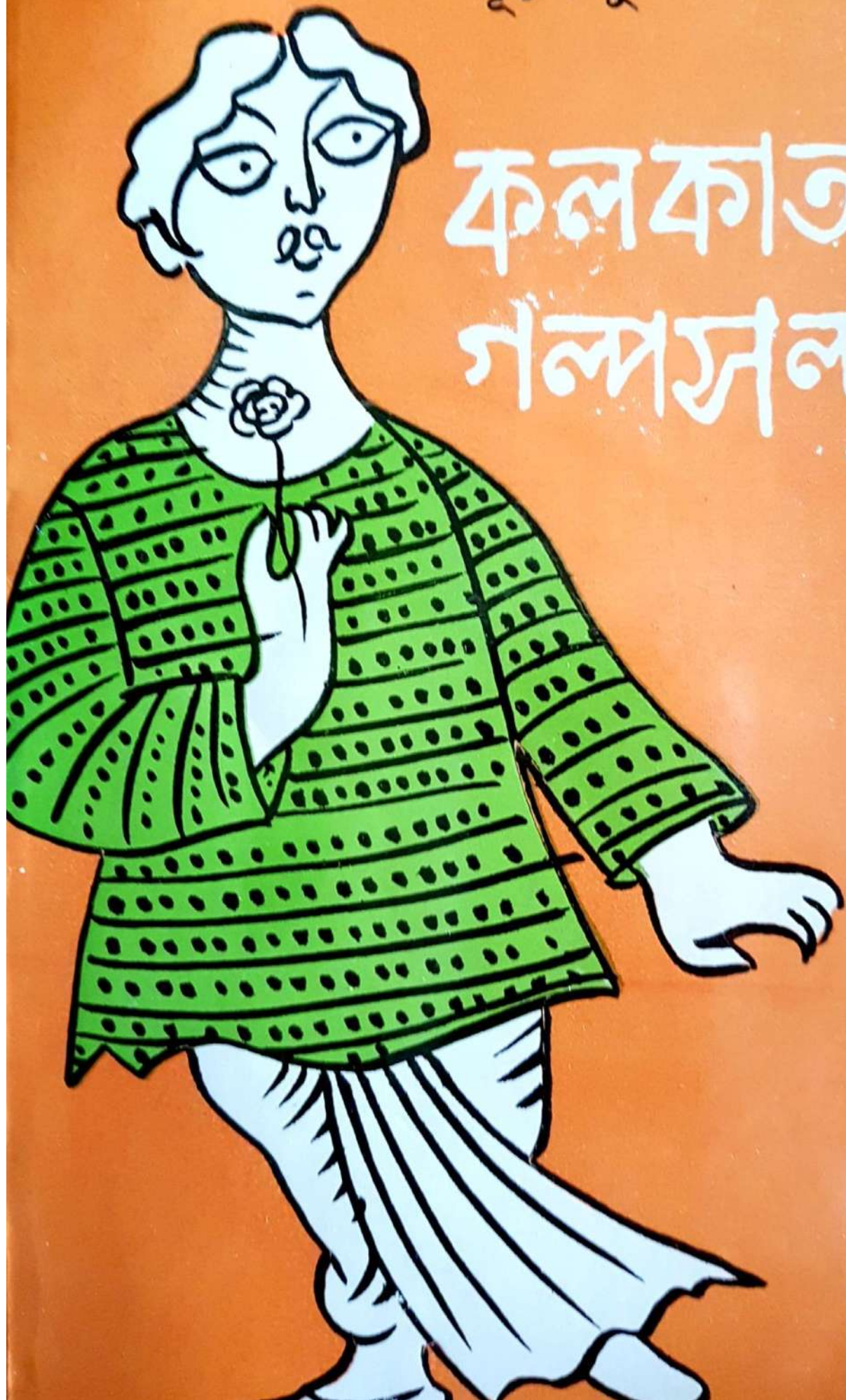


পূর্ণেন্দু পত্নী

কলকাতার গল্পসংলগ্ন



কলকাতার গল্পসল্প

পূর্ণেন্দু পত্রী
কলকাতার গল্পসল্প



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

KOLKATAR GALPO SALPO

A Collection of short stories based on Kolkata in Bengali
by PURNENDU PATTREA

Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing

13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041

e-mail : deyspublishing@hotmail.com

www.deyspublishing.com

₹ 40.00

ISBN 978-81-295-2636-6

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৪

প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০০২, অগ্রহায়ণ ১৪০৯

তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৯, আশ্বিন ১৪১৬

চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৫, অগ্রহায়ণ ১৪২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

শিরোনামের ছবি : সমীর বিশ্বাস

৪০ টাকা

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নন্দিনী ও নীলকে

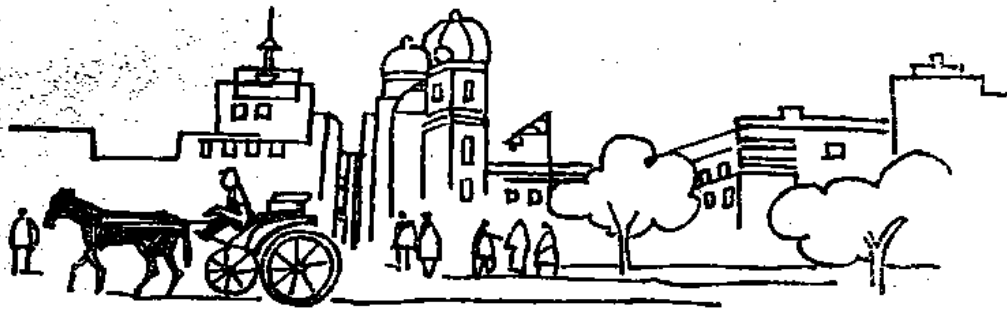


এই লেখকের কলকাতা নিয়ে অনবদ্য বই

কলকাতার প্রথম
পুরনো কলকাতার পড়াশুনো
কী করে কলকাতা হলো
ছড়ায় মোড়া কলকাতা
কলকাতার রাজকাহিনী

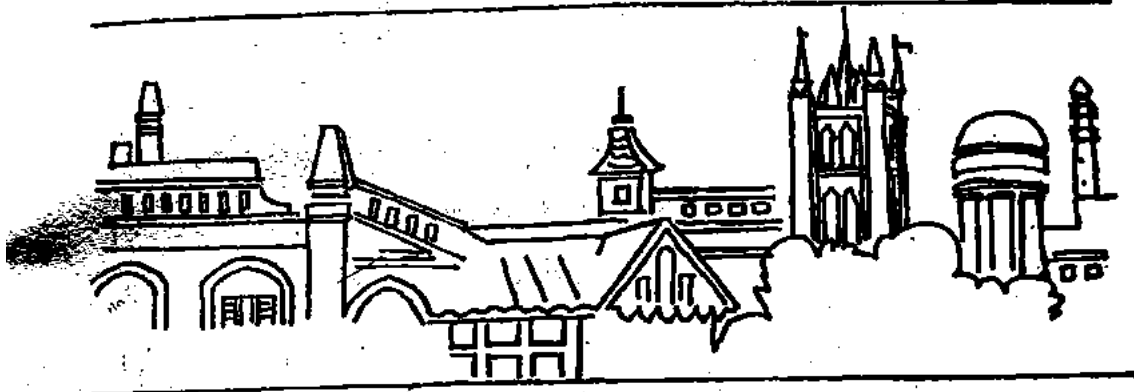
অন্যান্য বই

হাসতে হাসতে খুন
জুনিয়ার ব্যামকেশ জিন্দাবাদ
জাম্বো দি জিনিয়াস
ওদের চোখে মোদের ভারত



নতুন কলকাতার ইট-কাঠ-ইস্পাতের ভিড়ে পুরনো কলকাতার ধুলো-বালিটুকুও হারিয়ে যেতে বসেছে আজ। পুরনো কালের কলকাতা এখন ঠাই পেয়েছে শুধু মাত্র ইতিহাসের বইয়ে, ছাপা ছবিতে। ইতিহাসের সেইসব হলুদ পাতা ঘাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝেই আমাদের চোখে পড়ে অদ্ভুত সব কাহিনী। হয়তো সত্যি। হয়তো গল্প। কিন্তু শুনতে ভাল। পড়তে মজা। কলকাতার যে কালটাকে আমরা চোখে দেখিনি, এইসব স্বপ্ন মাপের গল্প-কথার ভিতর দিয়ে তারা যেন ধোপহরস্ত সাজপোশাকে সেজেগুজে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, জ্বাস্ত হয়ে। আমাদের মন বলে ওঠে, সত্যি নাকি?

তোমাদের কাছে এবার উপুড় করছি সেই ঝুলি, যার ভিতরে এখন থেকে সেখান থেকে কুড়িয়ে-হাতড়িয়ে জড়ো করা হয়েছে পুরনো কলকাতার নানান রঙের গল্পসল্প।



॥ আতরের লড়াই ॥

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হবার পর কলকাতার বেশ কয়েকজন বাঙালী হঠাৎ হয়ে উঠলেন বিরাট ধনী। ধন-দৌলতের শেষ নেই যেন। আর তেমনি তাঁদের বাবুয়ানি। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে আছে বাড়িতে। নাচ-গান আমোদ-ফুটির ফোয়ারা ছুটছে দিনেরাতে। অমিতব্যয়ের অস্ত নেই। অফুরন্ত অপব্যয়টাই যেন তাঁদের ব্রত। এইসব বাবুদের যেমন ধুলোর মত টাকা ওড়ানোর নেশা, বাবুর বাড়ির ভৃত্যদের ঠিক তেমনি টাকা কুড়ানোর নেশা। কোন ভৃত্য বাবুকে পরামর্শ দিলে, বাব্বের ভিতরে টাকা-পয়সাগুলো সঁতিয়ে যাচ্ছে। একটু রোদে দেওয়া দরকার। বাবু শুনেই হুকুম দিলেন, শুকোতে দাও এখুনি। ঝন্ঝন্ করে টাকার বস্তা উপুড় করে দেওয়া হস্ত উঠানে। তারপর শুকনো টাকা পুনরায় বাব্বের তোলবার সময় ভৃত্য জানালে, হজুর, টাকা রোদে শুকিয়ে মন পিছু আড়াই সের করে কমে গেছে। বাবু শুনে বললেন, গেছে তো গেছে।

বুঝতেই পারছো, বাবুর সর্বনাশ আর ভূতোর পৌষ মাস।

একবার এক বাবুর বাড়িতে উই ধরেছে কাঠের আসবাব।
ভূতা এসে জানালে, ছজুর বড় বড় ঝাড়লঠনগুলোতেও উই ধরেছে।
সব ঝাঁঝরা। ওগুলো এখনি বেচে দিয়ে নতুন ঝাড়লঠন না কিনলে
আপনার মান-সম্মান থাকবে না। শুনে বাবু বললেন, তাহলে
বেচে দাও। তোমরা জান, কাচে উই ধরে না। কিন্তু বাবুর তখন
অতশত ভাববার মত সময় নেই। কিংবা জেনেশুনে এই ভাবে
ঠকাটাও ছিল হয়তো একরকমের আমোদ। বাবুর ঠকে সুখ।
ভূতোর ঠকিয়ে সুখ।

কোনও কোনও বাবুর বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার বাসনপত্র সবই
ছিল সোনা আর রূপোর। কোনও কোনও বাবুর ধুতি আসতো ঢাকা
থেকে। তখনকার দিনেই এক-একটা ধুতির দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ।
ধুতি এলে বাবু প্রথমেই ছিঁড়ে ফেলতেন তার পাড়। কারণ শক্ত
পাড়ের ঘষা লেগে দাগ ধরে যেতে পারে বাবুর কোমরে। এবং বাবু
একবার যে ধুতি পরতেন, সারা জীবনে দ্বিতীয়বার সে ধুতি ছুঁতেন
না। কোনও কোনও বাবুর বাড়িতে রাতের বেলায় এত আলো
জ্বলত যে, বাড়ির বাইরেটাকেও মনে হত দিন। আবার কোনও
কোনও বাবুর রাজপ্রাসাদ প্রত্যেক দিন ধোয়া-মোছা হত আতর
আর গোলাপ জল দিয়ে।

পাশাপাশি দুই বাবুর বাড়ি শোভাবাজারে। একজন রাজা
নবকৃষ্ণ দেব। আরেকজন চুড়ামনি দত্ত। দেব আর দত্তদের মধ্যে তখন
চলেছে তুমুল লড়াই, কে বড় আর কে ছোট এই নিয়ে। ইংরেজদের
সঙ্গে নবকৃষ্ণের দহরম-মহরম দেখে চুড়ামনি ভিতরে ভিতরে রেগে
লাল। রোজই সুযোগ খোঁজেন, কি করে জব্দ করা যায় নবকৃষ্ণকে।
বয়সে বড় বলে চুড়ামনি নবকৃষ্ণকে বলতেন, নব।

একদিন এক গরীব বামুনের ছেলের কানে জমল পুঁজ। বাবু
ছুটলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন, এর একমাত্র ওষুধ, পচা
আতর। পচা আতর? সে আমি কোথায় পাব? ছা-পোষা গরীব।

মনের দুঃখে ঘরে ফিরতে ফিরতে তাঁর মনে পড়ে গেল হঠাৎ রাজা নবকৃষ্ণের কথা। ওনারা অত বড় ধনী মানুষ। চাইলে কি আর একটু পচা আতর দেবেন না?

হাতে একটা ছোট পাথরের বাটি নিয়ে গরীব বামুন এসে দাঁড়ালেন রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ির দরজায়। দেখা হয়ে গেল রাজ-কুমার গোপীমোহনের সঙ্গে।

—কি চাই?

—আজ্ঞে, আমার ছেলের কানে জমেছে পুঁজ। ডাক্তার বললেন, পচা আতর লাগালে তবে সারবে। তাই এসেছি একটু আতর মাগতে।

—তা আতর চাই তো, এখানে কেন? পাশেই চুড়ামনি দস্তুর বাড়ি। সেখানে চলে যান। আতর পেয়ে যাবেন।

সরল মনের বামুনটি যখন পা বাড়িয়েছেন চুড়ামনির বাড়ির দিকে, গোপীমোহন আবার ডাকলেন তাঁকে।

—শুনুন, চুড়ামনি দস্ত খুব উচু-মেজাজের মানুষ। এক ফোঁটা একটা পাথরের বাটি নিয়ে আতর চাইতে গেলে তিনি হয়তো লাল হয়ে যাবেন রেগে। একটা কলসী নিয়ে যান।

চুড়ামনি দস্ত তখন তেল মাখছিলেন। বামুন এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

—কি চাই?

—আজ্ঞে, একটু আতর।

—পাত্র এনেছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে কলসী।

কলসী দেখেই চুড়ামনি বুঝে গেলেন এর পিছনে লুকিয়ে আছে কোন রহস্য। তাঁকে অপ্রস্তুত করবার ফন্দী এঁটেছে কেউ। তিনি তখনি হাঁক দিলেন

—আতরওয়ালাকে ডাকো।

এসে গেল আতরওয়াল।

—এই ব্রাহ্মণের কলসীটা ভরে দিতে কত টাকা আতর লাগবে?

—আজ্ঞে, আড়াই হাজারের মতো।

—ভরে দাও।

আতরওয়ালা ভরে দিল কলসী।

—ঠাকুর, এবার তুমি কলসীটা নিয়ে, যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তাদের দেখিয়ে এসো। আর শোনো, গোপীমোহন ছেলেমানুষ। ওকে দেখিয়ে কোন লাভ নেই। তুমি নব-কে গিয়ে দেখাবে।

যেমন পরামর্শ, তেমন কাজ। কলসী ভর্তি আতর দেখে গোপীমোহন লজ্জায় নীল। নবকৃষ্ণও রাগে লাল।

রাজবাড়িতে আতর বোঝাই কলসী দেখিয়ে গরীব বামুনটি আবার যখন ফিরে এলেন চুড়ামনি দত্তের কাছে, তিনি বললেন

—ঠাকুর, এত আতর নিয়ে আপনার কি হবে? আমি আড়াই হাজার টাকা দিচ্ছি। আমাকে দিয়ে দিন।

ব্রাহ্মণ পাথর বাটিতে আতর আর পকেটে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মনের খুশিতে নাচতে নাচতে।

চুড়ামনির খরচ হয়ে গেল পাঁচহাজার টাকা। তাতে খেদ নেই। আতরের লড়াইটাতে তো জিত হল তাঁর। নব-র মাথাটাকে তো নীচু করা গেল। এটা কি কম কথা? এই একই গল্প আবার উলটে-পালটে পরে হয়েছে অল্প রকম। সেখানে রাজা নবকৃষ্ণের জায়গায় গোকুলচন্দ্র মিত্র। আর চুড়ামনি দত্তের জায়গায় রামতনু দত্ত। হাটখোলার মদনমোহন দত্তের ছেলে। তখনকার লোকে বলতো, বাবু তো বাবু তনু বাবু।

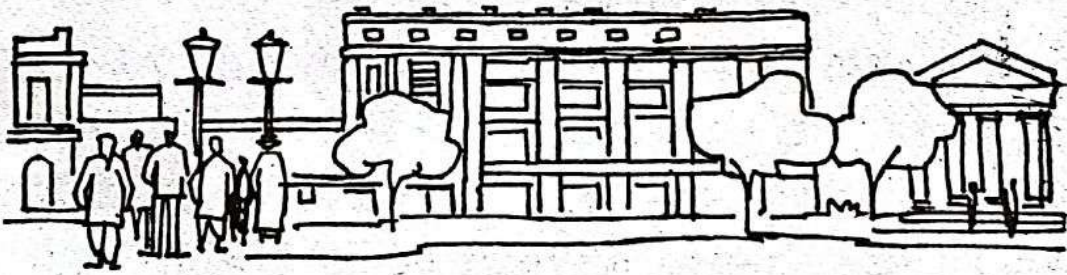
এই তনুবাবু কী রকম বাবু তার একটা নমুনা শোনো। নীলমনি হালদার তখনকার কালের এক নামজাদা বড়লোক। তনুবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনিও বাবুগিরির গৌরবে মাতোয়ারা। একবার বিলেত থেকে আনিয়েছেন একটা প্রকাণ্ড আয়না। বিস্তর দাম। আর যেমন দাম, তেমন দেখতে। কাচ তো নয়, যেন ভরা দীঘির নীল জল। নীলমনি ভাবলেন, এ রকম আয়না তো তনুবাবুর

বাড়িতে নেই। তাঁকে দেখাতে পাঠাই। নীলমনির কর্মচারীরা আয়না নিয়ে তলুবাৰুৰ বাড়িতে হাজির। তলুবাৰু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আয়নাটা দেখতে গিয়ে তার এক কোণে খুঁজে পেলেন এক রত্তি একটা দাগ। দাগ দেখেই বাঘের গর্জন।

—ছিঃ ছিঃ, এই রকম দাগ-ধরা আয়না কিনেছে নীলমনি! তক্ষুনি সেই আয়নাকে ভেঙে ফেললেন আছাড় মেরে। নীলমনির কর্মচারীরা তো কাণ্ড দেখে ভয়ে জড়োসড়ো।

তলুবাৰু বললেন

—যাও, তোমাদের প্রভুকে গিয়ে বল, এই আয়নাটার যা দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি। বিলেত থেকে যেন আরেকটা দাগ-হীন আয়না আনিয়৆ নেয়। নীলমনি হালদারের বাড়িতে দাগ-ধরা আয়না থাকবে, এটা সহ করা অসম্ভব।



॥ হিসেবের লড়াই ॥

পলাশী যুদ্ধের আগের কথা।

কলকাতায় তখন ইংরেজদের দারুণ দাপ-দাপট। ইংরেজরাই কলকাতার প্রভু, গাঁয়ে না মানলেও আপনি মোড়লের মত। সেই তখন, ইংরেজরা নিজেদের কাজের সুবিধের জন্তে এক-আধজন বাঙালীকে দিয়ে বসতো বড়-সড় মাপের চাকরি। তার মধ্যে সবচেয়ে মান-সম্মানের চাকরিটা ছিল, কালা জমিদার। ইংরেজদের ভাষায়,

ব্রাহ্ম জমিদার। এঁদের কাজ ছিল খাজনা আদায়, জমি বিক্রি,
হাট-বাজার গড়ে তোলা এইসব। প্রথমে নন্দরাম সেন, তারপর
রামভদ্র চৌধুরী। আর তার পরেই সবচেয়ে নামডাকওয়ালা জমিদার
গোবিন্দরাম মিত্র। যেমন তাঁর বিত্তে, তেমনি তাঁর বুদ্ধি। গর্জনে
বাঘ, বর্ষণে মেঘ। ছুষ্ঠের বেলায় দশানন। শিষ্টের বেলায় রাম।
তাঁকে নিয়ে অনেক ছড়ার চলন ছিল কলকাতায়।

কালো দেশের কালো মানুষ

কালো জমিদার

গোবিন্দরাম মিত্র আনে

ছুড়ি গাড়ির বাহার।

কিংবা

বনমালী সরকারের বাড়ি

গোবিন্দরামের ছড়ি

উমিচাঁদের দাড়ি

হুজুরীমলের কড়ি।

ছড়া ছুটোর দিকে ভাল করে তাকালেই আসল গোবিন্দরামকে
সহজেই চেনা যাবে। ছড়ি দিয়ে শাসন করতেন কলকাতা। গাড়ি
হাঁকিয়ে ফুটি করতেন মনের সুখে। হ্যাঁ, খুবই সৌখীন বাবু ছিলেন
তিনি। জমিদার হওয়ার বছর আঠেকের মধ্যেই নিজের বাড়ির
গায়ে বানিয়ে তুললেন এমন একটা মন্দির যার উচ্চতা এখনকার
অকটারলোনি মনুমেন্টের চেয়ে বেশী। বাঙালী পাড়ায় সে মন্দিরের
নাম ছিল নবরত্ন মন্দির। কারণ তার চুড়োর সংখ্যা নয়। সাহেব
পাড়ার বাসিন্দেরা নাম দিয়েছিল, ব্রাহ্ম প্যাগোডা। গোবিন্দরাম
তখন রোজগার করেন হুঁহাতে, খরচ করেন চার হাতে।

এহেন ডাকসাইটে জমিদারের সঙ্গে একবার ইংরেজদের লাগল
লড়াই। হিসেবের লড়াই। কলকাতার আসল জমিদার তখন হল-
ওয়েল সাহেব। গোবিন্দরামের উপরওয়ালা। তিনি একদিন হুঁকার
দিয়ে উঠলেন

—হিসেব দেখাও । খাতাপত্তর আনো ।

হলওয়েল সাহেবের খারগা, ইংরেজদের ঠাকিয়ে টাকা ঠাকি দিচ্ছে লোকটা । নইলে এত ধনদৌলত, বাবুগিরি, আনন্দ-কুর্তি হচ্ছে কোথা থেকে ? টাকা তো আর গাছে ফলে না ।

হলওয়েল হাঁক পাড়েন । গোবিন্দরাম চুপ । যেন বোবা, কিংবা কানে কালা ।

দেখেশুনে, রেগে লাল হয়ে লালমুখো হলওয়েল একদিন সরাসরি তলব করলেন গোবিন্দরামকে । গোবিন্দরাম হাজির । কিন্তু হাতে না খাতাপত্তর, না হিসেব নিকেশ ।

—হিসেব কই ?

—হিসেব আছে । কিন্তু তুমি হিসেব চাইবার কে ?

—আমি তোমার উপরওয়াল ।

—তোমারও উপরওয়াল আছে । কলকাতা কাউন্সিল । কাউন্সিল ডাকুক । তখন হিসেব দেবো ।

যথাসময়ে কাউন্সিলও চটে-মটে হিসেব চাইলে গোবিন্দরামের কাছে ।

—তোমার বিরুদ্ধে তহবিল তহরুপের অভিযোগ । হিসেব দেখাও ।

গোবিন্দরাম কাউন্সিলের সামনে হাজির হয়ে জবাব দিলেন

—হিসেব ছিল । কিন্তু এখন আর নেই ।

—কোথায় গেছে ?

—উড়ে গেছে । ঝড়ে । ১৭৩৭-এর সেই যে ভয়াবহ সাইক্লোন হল কলকাতায়, সেই যে ছজুর আপনাদের গীর্জার চূড়া ভাঙল, আমার নবরঙ্গ মন্দিরের মাথা মুড়োল, কত মানুষ মরল, কত জাহাজ ডুবল, সেই ঝড়ে ।

কাউন্সিল হতবাক । বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করলেন যুক্তিটা । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এসে গেল অন্য প্রশ্ন ।

—বেশ তো ১৭৩৭-এর পর থেকে হিসেব দেখাও ।

—হিসেব ছিল হুজুর, কিন্তু এখন নেই।

—কি হল ?

—উই-এ খেয়ে গেছে।

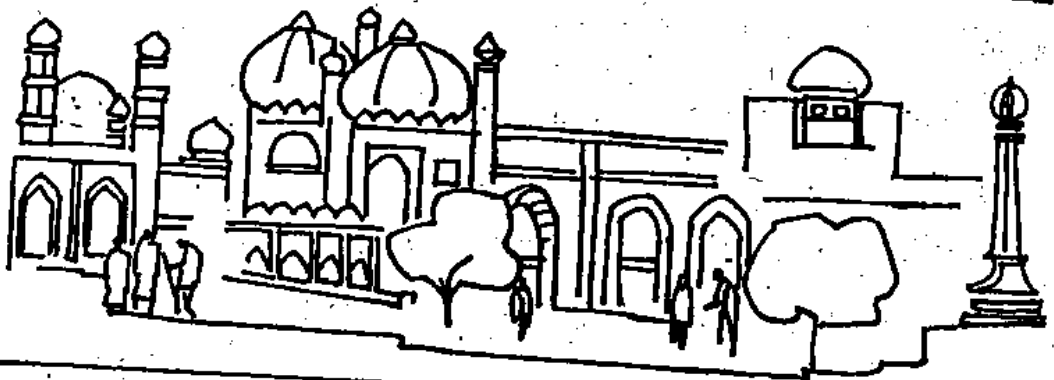
—উই-এ হিসেব খেয়ে গেছে ?

—হিসেব খায়নি হুজুর। হিসেবের নথিপত্র খেয়ে গেছে।

—উই-এ ওসব খায় বুঝি ?

—হুজুর, আপনাদের হিসেবের খাতা খুলে দেখুন, কোম্পানীর
শুদামের কত মালপত্র, দামী জামা কাপড় খেয়ে গেছে উই-এ।
মনে নেই হুজুর, ঝড়ে যখন আপনাদের গীর্জাটা ভেঙে গেল, তার
পরেই তো উই ধরল গীর্জার ভিতরের অর্গানটায়। উই-এ সব খায়
হুজুর।

কাউলিল থ। গোবিন্দরাম সেরারের মত খালাস, তহবিল
তহরুপের দায় থেকে।



॥ বুলবুলির লড়াই ॥

আজ থেকে দেড়শো ছ'শো বছর আগেকার সেই আত্মিকালের
কলকাতাকে আর আমাদের চোখ চেয়ে দেখবার উপায় নেই। সে-
সব দিনকাল কবেই হারিয়ে গেছে সময়ের অতল তলে। তবু ইতিহাস
কিছু কিছু ছবি এঁকে রাখে তার রোজনামচার খাতায়। কোনো
পাতায় রক্ত কিংবা রামধন্য রঙের টুকরো টুকরো ঘটনা। কোনো

পাতায় দু-দশটা বড়ো-সড়ো মাপের মানুষের মুখ। কোনো পাতায়
সেকালের সব যান-বাহন, পালকি-টালকি, ঘোড়ায় টানা নানান
রকম নামের গাড়ি-ঘোড়ার ছবি। আবার কোনো পাতায় মানুষজনের
সাজ-পোষাক, আসবাবপত্র, হুকো-গড়গড়া, টানা-পাখা, লম্বা
হাতলে দৈতি-দানবের কানের মতো তালপাতার হাত-পাখা,
বাতিদান, ঝাড়-লঠন, মাথার পাগড়ী, মুখের গৌফ, কোমরের
চাপকান এমনি রঙ-বেরঙের নকশা। বড় হয়ে এইসব ইতিহাসের
পাতা ওলটাতে ওলটাতে তোমাদের একদিন হঠাৎ চোখে পড়ে যাবে
একটা আশ্চর্য ঘটনা। দেখতে পাবে সে-ঘটনার মাথার উপরে
চকুচকে-ঝকুঝকে অক্ষরে লেখা আছে, বুলবুলির লড়াই। অবাক হয়ে
ভাববে, এ আবার কি? হাতি নয়, ঘোড়া নয়, বাঘ নয়, সিংহি নয়,
এক ফোঁটা একটা পাখি বুলবুলি, সে আবার করবে লড়াই? তারপর
ইতিহাসের পাতায় অক্ষরের উপর দিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে
যখন সবটা পড়া শেষ হয়ে যাবে, তখন দেখবে, ওমা, সত্যিই তো,
বুলবুলিরাও লড়াই জানে দেখছি।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় এক ধাঁচের মানুষ
বাস করতো, ইতিহাস তাদের নাম দিয়েছে, বাবু। এইসব বাবুদের
চেহারাগুলোই আলাদা। চরিত্র প্রায় সকলেরই এক। সব বাবুদেরই
রা এক, রুচি এক, আমোদ-আহ্লাদ এক, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, সাধ-
আহ্লাদ এক। এইসব বাবুরা ফারসী বলতে পারতেন গড়গড়িয়ে,
ইংরেজী খুঁড়িয়ে। দিন কাটাতেন ঘুমিয়ে। সন্ধ্যা কাটাতেন সেতার,
এসরাজ, অথবা বীণা বাজিয়ে। কোনদিন শুনতেন হাফ-আখড়াই
অথবা কবিগান অথবা পাঁচালি। রাত বাড়লে যে যার নিজের বাগান
বাড়িতে।

বাবুদের মাথায় থাকতো ঝাঁকড়া চুল। চুলে থাকতো নদীর ছোট
ছোট পলকা ঢেউয়ের মতো বাউরি। দাঁতে মিশি, হাতে গোলাপ।
পরনে ফিনফিনে কালো পাড়ের ধুতি। গায়ে মসলিন বা কেমরিকের
বেনিয়ান, গলায় কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো চুনট করা উড়ুনি।

পায়ে পুরু বকলস্ দেওয়া চীনে বাড়ির জুতো। ঠোঁটের উপরে ভোমরার ডানার মত কালো কুচকুচে গৌফ। চোখের নীচে শুকনো নদীর জলের রেখার মতো সূর্যার সরু টান।

দিনের যে-টুকু অংশ জেগে থাকতেন এই সব বাবুরা, তখন চলতো নানান রকম আমোদের খেলাধুলা। তার মধ্যে ছোটো হল—ঘুড়ি ওড়ানো আর বুলবুলির লড়াই। ঘুড়ি ওড়ানো হত কখনো বাড়ির ছাদে, কখনো গড়ের মাঠে। সে সব ঘুড়ির নামও ছিল অনেক রকম। ঢাউস ঘুড়ি, মানুষ ঘুড়ি, চিলে ঘুড়ি, আরও কত কি। ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে শহরের মানুষ কেঁটিয়ে এসে জমা হতো গড়ের মাঠে।

বুলবুলির লড়াই তার চেয়েও জবর খেলা। আর সে সময়ের কলকাতায় এই খেলার সেরা খেলোয়াড় ছিলেন ছাত্তাবু-লাট্টাবু নামে দুই ভাই। ছাত্তু বড়। লাট্টু ছোট। ছাত্তুর ভাল নাম আশুতোষ দেব। লাট্টুর ভাল নাম প্রমথ দেব। আসল পদবী দেব সরকার। বাবা বিখ্যাত ধনী রামহুলাল সরকার। তিনি কি করে বড়মানুষ হলেন, সেও শুনবার মত কাহিনী বটে। সেকালের কলকাতার ডাকসাইটে বাবু তনুবাবুর বাবা মদনমোহন দত্তের কাছে কাজ করতেন সরকার হিসেবে। মাস-মাইনে পাঁচ টাকা। পরে হলেন জাহাজ সরকার। মাইনে দাঁড়াল দশ। এই সময়ই ভাগ্যদেবী নিজের হাতে চন্দন গুলে টিপ এঁকে দিলেন রামহুলালের কপালে। মদনমোহন তাঁকে পাঠালেন টালা কোম্পানীর নিলাম থেকে একটা কিছু কিনতে। হাতে তুলে দিলেন চোদ্দ হাজার টাকা। রামহুলাল নিলামের আপিসে এসে পৌঁছিলেন যখন, তখন নিলাম শেষ। রামহুলাল বিমর্ষ। বসে আছেন মন-মরা। এমন সময় শোনা গেল নিলাম হবে একটা ডুবো জাহাজের। শুরু হল নিলাম ডাকা। সকলের চেয়ে বেশী দাম হাঁকলেন রামহুলাল। চোদ্দ হাজার। জাহাজ কিনে পাশের ঘরে বিজ্রাম করছেন। এমন সময় পড়ি কি মরি করে এক সাহেব এসে হাজির। শুনলেন, একজন বাঙালী ডুবো-

জাহাজটা কিনে নিয়েছে খানিক আগে। সাহেব ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। প্রথমেই তো ধমক-ধামক, ভয় দেখানো। রামহুলাল নির্ভাবান মানুষ। তিনি সাহেবের ধমকে কঁচো হয়ে যাবেন এমন থলথলে মনে মানুষ নন। বিপদ বুঝে সাহেব এলেন বোঝাপড়ায়, দরদস্তুরে। শেষ পর্যন্ত ডুবো জাহাজের দাম ঠিক হল, এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা। লাভের করকরে এক লক্ষ টাকা নিয়ে রামহুলাল তুলে দিলেন প্রভুর হাতে। প্রভুও তেমনি। জীবনে বৃষ্টি ছুটি দেখেন নি এমন নির্লোভ মানুষ। মদনমোহন রামহুলালকে বললেন, লাভের একলক্ষ টাকাটা তোমারই পাওনা, তোমার সততা-সাধুতার পুরস্কার।

তারপর থেকে দ্রুত বদলাতে লাগল রামহুলালের জীবন। লক্ষ্মী তাঁর মাথার উপরে উপুড় করে দিলেন নিজের ঝাঁপি। কেনা-বেচার ব্যবসা শুরু করে দিলেন দেশ-বিদেশের সঙ্গে। আমেরিকার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যের শুরু হল তাঁরই চেষ্টায়। বিয়ে করেছিলেন দু'বার। প্রথম পক্ষে একটি মাত্র মেয়ে। ছেলে হয়েছিল। বাঁচেনি। তাই আবার বিয়ে। দ্বিতীয় পক্ষে পাঁচ মেয়ে। দুই ছেলে। সেই দুই ছেলেই ছাত্তাবু আর লাটুবাৰু।

যখন মারা গেলেন তখন তাঁর সম্পত্তির দাম ২৩ লক্ষ টাকা। তাঁর আদৌ ছেলেরা খরচ করল ৫ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে কাঙালী বিদায়েই ৩ লক্ষ।

রামহুলাল সারা জীবনে রোজগার করেছেন দু'হাতে, দান করেছেন চার হাতে। কলকাতার মানুষ তাই তাঁর মাথায় পরিচয় দিয়েছিল সম্মানের উপাধি, ধনকুবের। রামহুলাল কীভাবে দাতা হলেন, তা নিয়েও একটা মজার গল্প লেখা আছে তাঁর জীবন-কাহিনীর পাতায়।

একবার এক পাগল এসে হাজির হল তাঁর কাছে। পাগলের হাতে একটা মরা পায়রা। আর সেই পায়রার গায়ে অসংখ্য পিঁপড়ে। পায়রার পচা মাংসে তারা খুঁজে পেয়েছে প্রাণ-ভরা খাবারের সুখ। একে পাগল, তার উপরে মরা পায়রা দেখে রামহুলালের মনে মনে রাগ। পাগলটা সেই সময় তাঁর মুখের সামনে মরা

পায়রাটা তুলে ধরে প্রশ্ন করলে

—বল তো এটা কি ?

রামহুলালের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ক্রোধ ।

—এ মরা পায়রাটাকে কোথা থেকে আনলে ?

প্রশ্ন শুনেই সেই পাগল রেগে আগুন ।

—কি বললে, এটা মরা ? লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্তের মুখে যে বিলিয়ে দিয়েছে নিজের শরীর, সে মৃত ? আর তুমি মনের আনন্দে টাকার গদির উপর বসে আছো বলে ভাবছ তুমি জীবিত ? ধিক্ তোমাকে ।

পাগল যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল ।

পরের মুহূর্ত থেকে অনুশোচনায় পাগল হয়ে উঠলেন রামহুলাল । আর তারপর থেকেই খুলে দিলেন তাঁড়ার ঘরের দরজা, অবিরল দান-ধ্যানের জন্তে । সেই দিনই বেলগাছিয়ার বাগানে খোলা হল অতিথিশালা । গরীব দুঃখী যে যখন আসবে, তার জন্তেই অন্নের থালা সাজানো । নিজের বাড়িতেও জারি করে দিলেন হুকুম । কেউ যেন বিনা-আহারে ফিরে না যায় । কলকাতায় হিন্দু কলেজ হবে, দান করলেন ৩ লক্ষ টাকা । মাদ্রাজের ছাত্তক্ষ নিয়ে টাউন হলে সভা । দিলেন এক লক্ষ টাকা । বেনারসে গড়ে দিলেন ১৩টা শিবমন্দির, দু' লক্ষ টাকা খরচ করে ।

রামহুলাল টাকা রোজগার করেছিলেন গায়ের রক্ত জল করে । ছাত্তবাবু এবং লাটুবাবুকে নড়েচড়ে রোজগার করতে হল না এক পয়সাও । জন্মেই পেয়ে গেলেন ঐশ্বর্যের স্বাদ-গন্ধ । তাই টাকার প্রতি তাঁদের মায়া-মমতা যে খানিকটা কম হবে, সে তো জানা কথাই । তাই তাদের হাতে পড়ে টাকার পিঠে গজাল ডানা । টাকা পাখির মত দিনে দু-বেলা উড়তে লাগল অপব্যয়ের আকাশে-বাতাসে, যখন যেমন খুশি । দান-ধ্যান, পরোপকার, দেশসেবা সবই করেছেন ছাত্তবাবু । তবু শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু বিখ্যাত হয়ে রইলেন তাঁর বাবুয়ানির জন্তেই । আর তাঁর খেয়াল-খুশি খেলার সবচেয়ে বড় খেলাটা ছিল, বুলবুলির লড়াই ।

লড়াইটা হতো শীতকালে। এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, সেকালে এখানে ছিল বিরাট একটা মাঠ। লোকে তার নাম দিয়েছিল, ছাত্তুবাবুর মাঠ। যেদিন লড়াই সেদিন সারি সারি তাঁবু পড়ে যেতো ঐ মাঠে। সকাল থেকে সাজ সাজ রব। বেলা এগারটা বাজাল ঘড়িতে ঢং ঢং করে। অমনি লড়াই শুরু। বিকেল চারটেয় শেষ। মাঝখানে খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম সব ঐ তাঁবুতে।

মাঠ জুড়ে হাজার হাজার দর্শক। লড়াই-এর শেষ না দেখে ঘরে ফিরবে না কেউ। লড়াই হতো দু-পক্ষের বুলবুলির মধ্যে। একটা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হতো খাবার। তারপর জোড়াকে জোড়া বুলবুলি ছেড়ে দেওয়া হতো খাবারের সামনে। কে কতটা বেশী খেতে পারে তাই নিয়ে ডানা ঝাপটে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লাঠালাঠি ফাটা-ফাটি করতে করতে যে পক্ষের বুলবুলি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেতো খাবারের জায়গা ছেড়ে, সেই পক্ষের হার। কার হার, তার রায় দেবার জন্তে একজন করে বিচারকও থাকতেন হাজির। তাঁকে বলা হতো সালিশী। ছাত্তুবাবুদের নিজেদের বুলবুলি ছিল অগুস্তি। সারা বছর ধরে এই সব পাখিকে খাইয়ে-দাইয়ে, যত্ন-আত্তি করে তৈরী করা হতো লড়াকু করে।

একবার ছাত্তুবাবুর পাখির সঙ্গে লড়াই হয়েছিল মল্লিক বাড়ির হরনাথের পাখির সঙ্গে। জিতেছিলেন ছাত্তুবাবুরাই। সালিশী করে-ছিলেন রাজা সুখময়ের ছেলে বৈষ্ণনাথ রায়। সেটা ১৮৩৪-এর ঘটনা।

ছাত্তুবাবুর পাঁচ বোনের একজনের বিয়ে হয়েছিল সিমুলিয়ার মিত্তিরদের বাড়িতে। সেই বাড়ির ছেলে দয়ালচাঁদ মিত্র। ১৮৫৩। দয়ালচাঁদের বুলবুলির সঙ্গে লড়াই হল একদিন জোড়াসাঁকোর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের। রাজেন্দ্রনারায়ণ তিনবছর ধরে তালিম দিয়েছেন নিজের পাখিদের। তিনি ভেবেছিলেন, জেতাটা তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু পারলেন না। জিতে গেল দয়ালচাঁদের বুলবুলিরা। খেলা হয়েছিল মোট ৩৭ জোড়া পাখির মধ্যে। দয়ালচাঁদের জিত হল ২৭ বার। বাকী ১০ বার রাজার। সারা শহর সেদিন উপুড় হয়ে বুঁকে

পড়েছিল এই লড়াই দেখতে । শুরু হয়েছিল দশটায় । আড়াইটায়
শেষ । সেবারের লড়াইয়ের সালিশী ছিলেন হরিনারায়ণ গোস্বামী ।
লড়াই যে কলকাতার ইতিহাসে কতটা সাড়া তুলেছিল, তার প্রমাণ
ঐ লড়াই নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত-র দীর্ঘ কবিতা ।

একে একে রাজাজীর ভালো পাখি সব

অপর পক্ষীর কাছে হলো পরাভব ।

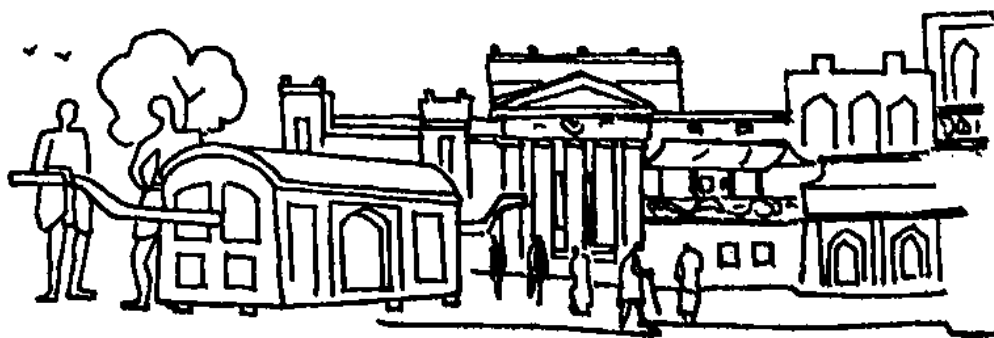
বুলবুলির লড়াই ঠিক কবে শুরু হয়েছিল আর কবে শেষ, তার
নিখুঁত হিসেব কোথাও মেলে না আর । যেটা মেলে সেটা একটা ছড়া ।
আর সেই ছড়া পড়ে আমরা জানতে পারি সেকালের কলকাতার
ষষ্ঠার্থ বাবুকে চিনে নেবার ন'টি লক্ষণ । তার মধ্যে বুলবুলির লড়াইটা
যে থাকবেই, সে তোমরা আগেই বুঝে গেছ । ছড়াটা শোনো ।

ঘুড়ি তুড়ি জস, দান

আখড়া বুলবুলি মুনিয়া গান

অষ্টাহে বনভোজন

এই নবখা বাবুর লক্ষণ ।



॥ জোড়াসাঁকোর সিংহ ॥

এবারে এক সিংহের গল্প ।

হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক একদিন ছুটি ছাত্রকে কী বেন
বোঝাচ্ছেন । ছুটি ছাত্রই মনোযোগ দিয়ে শুনছে । এমন সময় একজন

ছাত্র পিছন থেকে পাশের ছাত্রটির মাথায় সজোরে মারলে এক
টাটি। ছেলেটি উঠল চমকে। ধমকে উঠলেন শিক্ষক মশায়।

—একি! তুমি ওকে অকারণে টাটি মারলে কেন?

ছাত্রটির সবিনয় উত্তর

—স্যার, আমি জাতিতে সিংহ। তাই নিজের স্বভাবটা ছাড়তে
পারিনি।

টাটি খেয়ে সহপাঠী ছাত্রটি সম্ভবত কেঁদেছিল। টাটির স্বপক্ষে
এমন অকপট স্বীকারোক্তি শুনে শিক্ষক মশায় সম্ভবত হেসেছিলেন।

টাটি-মারা ছাত্রটি কিন্তু মিথ্যে কথা বলেনি। সে সিংহ পরিবারেরই
ছেলে। বাবা নন্দলাল সিংহ। ডাকনাম সাতু বাবু। পেশায়
দেওয়ান। অগাধ তাঁর বিষয়-সম্পত্তি। সুখের জীবন। সোনার
সংসার। জোড়াসাঁকোয় বিরাট অট্টালিকা। সম্ভ্রান্ত বংশ।

শান্তিরাম সিংহ বংশের আদি পুরুষ। ছিলেন মুর্শিদাবাদ আর
পাটনার দেওয়ান। ছিল এমাথা-ওমাথা ছড়ানো বিরাট জমিদারী
উড়িয়ায়। কলকাতার হিন্দু সমাজে যেমন নাম-ডাক তেমনি মান-
সম্মান। শান্তিরামের দুই ছেলে। প্রাণকৃষ্ণ আর জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের
ছেলে নন্দলাল।

আমরা যে সিংহের গল্প শুনে বসেছি, তিনি এই নন্দলালেরই
ছেলে। নাম কালীপ্রসন্ন। কিছুদিন হিন্দু কলেজের পড়ুয়া। পড়তে
পড়তে যেই পা পড়ল তেরোয়, অমনি ডাক পড়ল বিয়ের পিঁড়িতে।
বিয়ে হয়ে গেল মহা ধুমধামে। বাগবাজারের কনে। বেলীমাধব বসুর
মেয়ে। ছেলের যখন বিয়ে, বাবা তখন পরলোকে। নন্দলালের
সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হরচন্দ্র ঘোষ। ছোট আদালতের একজন বিচারক।
তিনিই এখন বন্ধুর সংসারের অভিভাবক। কোনো খুঁত রাখলেন না
বন্ধুর ছেলের বিয়েতে। নাচের আসর জমল বেশ কয়েকদিন ধরে।
সাহেব-মেমসাহেবদের জন্তে নাচ-গান, খানা-পিনার মজলিস। দেশীয়
বাবুদের জন্তে তুমুল ভোজ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্তে দান-খ্যান।

বিয়ের পর বছর-তিনেক মাত্র স্কুলে আসা-যাওয়া। তার পরই

হিন্দু কলেজের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল নয়।
কিন্তু লেখাপড়ায় আগ্রহী। তাই এখন থেকে বাড়িতে গৃহশিক্ষক
রেখেই যা কিছু শেখা। মিস্টার কার্ক পেট্রিক শেখান ইংরেজী। এ
ছাড়াও আছে বাংলা আর সংস্কৃতের শিক্ষক। তখন ইংরেজীরই দাপ-
দাপট। ইংরেজী পোষাক, ইংরেজী চাল-চলন, ইংরেজী বুলিদই
দাম বেশী। কালীপ্রসন্ন ইংরেজী শেখেন। কিন্তু তাঁর আসল টানটা
মায়ের মুখের ভাষার দিকে। ঘুমোবার আগে, ঘুম পাড়ানোর জগেই
ঠাকুমা শোনাতেন নানান রকম রূপকথা-উপকথা। মুখে মুখে আউড়ে
যেতেন কবিকঙ্কন, কুন্তিবাস, কাশীরাম দাসের পয়ার। কালীপ্রসন্ন
কান বড় সজাগ। একবার শুনেই মুখস্থ। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের কাছে
সেই সব শুনিয়ে জুটত বাহবা। ঘরে এসে মাকে শোনাতে জুটত
সন্দেশ। বেশী সন্দেশ খেলে তৌতলা হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে
ছাদে উঠে কাকদের ও পায়রাদের ডেকে ডেকে নেমস্তন্ন খাওয়ানো
চলত। কাক-পায়রারাও সবটা খেতে না পারলে তখন ডাক পড়ত
মুঞ্জুরী। মুঞ্জুরী হল সিংহি বাড়ির পোষা বেড়াল। ছুধের মত গায়ের
রঙ। ক্ষীরের মত মিষ্টি স্বভাব। কালীপ্রসন্নর বড় প্রিয় ছিল মুঞ্জুরী।

কালীপ্রসন্নর যখন ষোলোয় পা, তখন স্ত্রী গেছেন মারা। ফলে
আবার পরতে হল বিয়ের সাজ। আবার বরাসন, হাঁদনতলায়
শুভদৃষ্টি আর বাসর ঘর। এবারের কনে রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের
দৌহিত্রী, চন্দ্রনাথ বসুর একমাত্র মেয়ে। যে পরিবারে, যে রকম
পরিবেশে জন্ম তাতে কালীপ্রসন্নর সাজ-পোষাক, স্বভাব-চরিত্র অল্প
রকম হওয়ার কথা। দিনরাত ঘিরে থাকবে মোসাহেবের ঝাঁক।
তারা থেকে থেকে স্তোত্র পাঠের মত গুনগান গেয়ে যাবে। আর
একদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের জটলা। তাঁরা থেকে থেকে উচ্চারণ করবে,
কণজন্মা, যোগভট্ট, আরও নানান রকম মুখরোচক স্তুতি। পরনে থাকবে
লখনৌ ফাদানের চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটী,
পায়ে নাগরা, মাথায় বাঁকা টুপি। অথবা সেপাই পেড়ে চাকাই ধুতি,
কোমরে রঙিন রুমাল, মাথায় এ্যালবার্ট তেড়ি, কাঁধে শাল, দশ

আঙুলে হীরে-মুক্তোর দশটা আংটি। সামনে সোনার আলবোলা।
ডানদিকে পাশা-বসানো ফুরসি। বাঁয়ে হীরে-বসানো টোপদার গুড়-
গুড়ি। পিছনে মুক্তো বসানো পেঁচুয়া। মাথায় ঝাড়লগুন, টানা-
পাখা। পায়ের নীচে জরির মহলন্দ। এদিকে আতুরদান, ওদিকে
গোলাপপাশ। এদিকে তামাক, ওদিকে গাঁজা। সকালে সং, রাত্রে
হাফ-আখড়াই।

এইভাবে তখনকার আর দশটা বড় মানুষের ঘরের ছেলের
মতই কালীপ্রসন্নর উচ্ছ্বসে যাওয়ার কথা। কিন্তু কালীপ্রসন্ন হয়ে
উঠলেন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। তিনি চাইলেন বড় ঘরের ছেলে নয়,
বড় দরের মানুষ হতে। নিজেকে গড়তে চাইলেন তখনকার সমাজের
সেরা মানুষদের আদলে।

যখন মাত্র তেরো বছর বয়স, গড়লেন এক সমিতি। নাম
বিদ্যোৎসাহিনী সভা। সেখানে প্রবন্ধ পাঠ করেন তখনকার সেরা
লিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষেরা। যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার,
কৃষ্ণদাস পাল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অক্ষয়কুমার দত্ত। তখনকার সভায়
বক্তৃতা বা রচনা পাঠ হতো সাধারণত ইংরেজীতে। কালীপ্রসন্ন সে
নিয়ম ভাঙলেন। তিনি পড়লেন বাংলা প্রবন্ধ।

মারা গেছেন ডেভিড হেয়ার। তাঁর জন্তে স্মৃতিসভা করতে হবে।
সকলের আগে কে উঠোগী? কালীপ্রসন্ন। বললেন, সভা করার
জায়গা নেই? আমার বাড়ীতে হোক।

কলকাতায় তখন নাটকের চেহারাটা ভিখারীর মত। জেল্লা নেই,
জোলুষ নেই, শ্রী নেই, স্বাস্থ্য নেই। কালীপ্রসন্ন আর তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভা উঠে-পড়ে লেগে গেল মরা নাটকে ভরা জোয়ার
খানতে।

১৮৫৭, ফেব্রুয়ারী মাস। সিমলার আশুতোষ দেবের বাড়ীতে
অভিনয় হয়ে গেছে শকুন্তলার অভিনয়। জমে নি। দুমাস বাদে
এপ্রিলে কালীপ্রসন্নর বাড়িতেই তৈরী হল নাটকের দল। অভিনয়
ল, বেণীসংহার। দেশের মাথা-মাথা মানুষ এমন কি সাহেব-

সুবোরাও ছুটে এল নাটক দেখতে। প্রশংসা পেল। তবে মানানানি
ধরনের। কালীপ্রসন্ন এবার নিজে অনুবাদ করলেন, বিক্রমোদয়।
বয়স তখন মোটে সাতেরো। নভেম্বর মাসে অভিনয় হল সে-নাটক।
কালীপ্রসন্ন নিজে নামলেন পুরুষবার ভূমিকায়। তাতে অভিনয়
করেছিলেন আর একজন বিখ্যাত মানুষ। উমেশ বান্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। নাটক দেখে মুখে মুখে, কাগজে
কাগজে ধন্য-ধন্য রব। আর সিসিল বীডন তখন ভারত সরকারের
সেক্রেটারী। তিনি কালীপ্রসন্নের অভিনয় আর নাটক নিয়ে এই
উজ্জ্বল জগ্রে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দু-বছর পরে অনুবাদ করলেন আর
একটা নাটক, মালতীমাধব।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখনকার কালের একজন পণ্ডিত মানুষ।
ঠিক করলেন একটা মাসিক পত্রিকা বের করবেন ইংরেজীতে। নাম
হবে, মুখার্জিস ম্যাগাজিন। কিন্তু না-আছে টাকা, না পয়সা। থাকার
মধ্যে শুধু উজ্জম। কথাটা কানে এল কালীপ্রসন্নর। তিনি কিনে দিলেন
ছাপার মেশিন।

স্বদেশপ্রাণ বলতে সত্যিই যা বোঝায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর কাগজ, 'হিন্দু পেটিয়ট'। নীলকর
সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরীব প্রজাদের পক্ষ নিয়ে হিন্দু
পেটিয়ট-এর পাতায় পাতায় আগুন ছোঁটাতেন তিনি। সিপাহী
বিদ্রোহের সময়ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন
ভারতবাসীর স্বাধীন মতামত। এই হরিশ্চন্দ্র যেদিন মারা গেলেন,
দেশের সাধারণ মানুষ চাষাভুষো কেঁদে উঠলো ডুকরে। যেন মারা
গেছে আপনজন কেউ। সাধারণ মানুষের বেদনা থেকে জন্ম নিল
গান।

“অসময়ে হরিশ মল, লংগের হল কারাগার।”

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেটিয়ট'-এর কী হবে, এই চিন্তায়
সকলের কপালে যখন হুশিয়ার রেখা, কালীপ্রসন্ন এগিয়ে এলেন
সাহস করে। পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে নিলেন পত্রিকার স্বত্ব। পাঁচ

হাজার টাকা দান করলেন হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্তে। হরিশ্চন্দ্রের
ভাগ আর তেজস্বিতার বিষয়ে নিজে লিখলেন ছোট্ট একটা পুস্তিকা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাই
নিয়ে সারা দেশে তোলপাড়। অল্প কিছু বিদ্বান মানুষ এই নতুনকে
জানালেন স্বাগত। বাকীরা নিন্দায় মাতিয়ে তুললে আকাশ-বাতাস।
কালীপ্রসন্নর রক্তে গোড়ামি নেই। নিজের বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে
আয়োজন করলেন মাইকেল সংবর্ধনার। লেখালেন অভিনন্দন পত্র।
সমবেত হলেন দেশের সুধী মানুষেরা। ‘মহাকবি’ সম্বোধন করে
কালীপ্রসন্নই প্রথম শিক্ষিত সমাজে পাকা আসন পেতে দিলেন
মাইকেলের জন্তে।

দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন ‘নীলদর্পণ’ নাটক, নীলকর সাহেবদের
বীভৎস অত্যাচারে চাষীদের লাজ্জনা অপমানের জলজ্যাস্ত ছাপ
ফুটিয়ে। সে নাটককে ইংরেজরা যে দুচক্ষে দেখতে পারবে না সে তো
জানা কথাই। ইংরেজরা রাগে গরগর করবে জেনেও, মাইকেল মধুসূদন
সেটাকে অনুবাদ করলেন ইংরেজীতে। পাদরী লং সাহেব সেটা বের
করলেন ছেপে। তাতে আসল অনুবাদকের নাম ছিল না। নাম ছিল,
এ নেটিভ। ইংরেজের আদালতে বিচার হল তার। জরিমানা এক
হাজার টাকা। লং-এর মাথায় হাত। এত টাকা কোথায় পাবেন
তিনি! যাঁরা লং-এর গুণমুগ্ধ ভক্ত, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, তাঁদের মাথায়
যেন বজ্রাঘাত। কী করে কারাবাস থেকে বাঁচাবেন লংকে! সেই
দুঃসময়েই দেখা গেল এক বাঙালী যুবক আদালতের ভীড়ের ভিতর
থেকে এগিয়ে আসছেন লং-এর দিকে। হাতে টাকার থলি। লোকে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, কালীপ্রসন্ন। তিনি আগে থেকেই
অহুমান করে নিয়েছিলেন কী ঘটবে। তাই কাউকে না জানিয়ে
গোপনে টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়েই হাজির ছিলেন আদালতে।

কালীপ্রসন্নর জীবনে দেশপ্রেমের ঘটনা এক-আধটা নয়, অনেক।
কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় কীর্তি দুটো। এক হল, মহাভারতের
অনুবাদ। মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায়। এর পিছনে প্রবল উৎসাহ

স্ববোরাও ছুটে এল নাটক দেখতে। প্রশংসা পেল। তবে মাঝামাঝি ধরনের। কালীপ্রসন্ন এবার নিজে অনুবাদ করলেন, বিক্রমোর্বশী। বয়স তখন মোটে সতেরো। নভেম্বর মাসে অভিনয় হল সে-নাটক। কালীপ্রসন্ন নিজে নামলেন পুরুষবার ভূমিকায়। তাতে অভিনয় করেছিলেন আর একজন বিখ্যাত মানুষ। উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। নাটক দেখে মুখে মুখে, কাগজে-কাগজে ধন্য-ধন্য রব। স্মার সিমিল বীডন তখন ভারত সরকারের সেক্রেটারী। তিনি কালীপ্রসন্নের অভিনয় আর নাটক নিয়ে এই উত্তমের জন্তে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দু-বছর পরে অনুবাদ করলেন আর একটা নাটক, মালতীমাধব।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখনকার কালের একজন পণ্ডিত মানুষ। ঠিক করলেন একটা মাসিক পত্রিকা বের করবেন ইংরেজীতে। নাম হবে, মুখার্জিস ম্যাগাজিন। কিন্তু না-আছে টাকা, না পয়সা। থাকার মধ্যে শুধু উত্তম। কথাটা কানে এল কালীপ্রসন্নের। তিনি কিনে দিলেন ছাপার মেশিন।

স্বদেশপ্রাণ বলতে সত্যিই যা বোঝায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর কাগজ, ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরীব প্রজাদের পক্ষ নিয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট-এর পাতায় পাতায় আগুন ছোঁটাতেন তিনি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভারতবাসীর স্বাধীন মতামত। এই হরিশ্চন্দ্র যেদিন মারা গেলেন, দেশের সাধারণ মানুষ চাষাভুষা কেঁদে উঠলো ডুকরে। যেন মারা গেছে আপনজন কেউ। সাধারণ মানুষের বেদনা থেকে জন্ম নিল গান।

“অসময়ে হরিশ মল, লংডের হল কারাগার।”

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর কী হবে, এই চিন্তায় সকলের কপালে যখন ছশ্চিন্তার রেখা, কালীপ্রসন্ন এগিয়ে এলেন সাহস করে। পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে নিলেন পত্রিকার স্বত্ব। পাঁচ

হাজার টাকা দান করলেন হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্তে । হরিশ্চন্দ্রের
ত্যাগ আর তেজস্বিতার বিষয়ে নিজে লিখলেন ছোট্ট একটা পুস্তিকা ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত । তাই
নিয়ে সারা দেশে তোলাপাড় । অল্প কিছু বিদ্বান মানুষ এই নতুনকে
জানালেন স্বাগত । বাকীরা নিন্দায় মাতিয়ে তুললে আকাশ-বাতাস ।
কালীপ্রসন্নর রক্তে গোঁড়ামি নেই । নিজের বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে
আয়োজন করলেন মাইকেল সংবর্ধনার । লেখালেন অভিনন্দন পত্র ।
সমবেত হলেন দেশের সুধী মানুষেরা । ‘মহাকবি’ সম্বোধন করে
কালীপ্রসন্নই প্রথম শিক্ষিত সমাজে পাকা আসন পেতে দিলেন
মাইকেলের জন্তে ।

দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন ‘নীলদর্পণ’ নাটক, নীলকর সাহেবদের
বীভৎস অত্যাচারে চাষীদের লাঞ্ছনা অপমানের জলজ্যাস্ত ছাপ
ফুটিয়ে । সে নাটককে ইংরেজরা যে দুচক্ষে দেখতে পারবে না সে তো
জানা কথাই । ইংরেজরা রাগে গরগর করবে জেনেও, মাইকেল মধুসূদন
সেটাকে অনুবাদ করলেন ইংরেজীতে । পাদরী লং সাহেব সেটা বের
করলেন ছেপে । তাতে আসল অনুবাদকের নাম ছিল না । নাম ছিল,
এ নেটিভ । ইংরেজের আদালতে বিচার হল তার । জরিমানা এক
হাজার টাকা । লং-এর মাথায় হাত । এত টাকা কোথায় পাবেন
তিনি ! যাঁরা লং-এর গুণমুগ্ধ ভক্ত, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, তাঁদের মাথায়
যেন বজ্রাঘাত । কী করে কারাবাস থেকে বাঁচাবেন লংকে ! সেই
দুঃসময়েই দেখা গেল এক বাঙালী যুবক আদালতের ভীড়ের ভিতর
থেকে এগিয়ে আসছেন লং-এর দিকে । হাতে টাকার থলি । লোকে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, কালীপ্রসন্ন । তিনি আগে থেকেই
অনুমান করে নিয়েছিলেন কী ঘটবে । তাই কাউকে না জানিয়ে
গোপনে টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়েই হাজির ছিলেন আদালতে ।

কালীপ্রসন্নর জীবনে দেশপ্রেমের ঘটনা এক-আধটা নয়, অনেক ।
কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় কীর্তি দুটো । এক হল, মহাভারতের
অনুবাদ । মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় । এর পিছনে প্রবল উৎসাহ

যুগিয়েছিলেন বিজ্ঞানাগর। দ্বিতীয়টা হল ছতোম পাঁচটার নকশা।
এটা চলতি বা কথা ভাষায় লেখা সেকালের আশ্চর্য এক ইতিহাস,
সামাজিক দলিল। এ বইয়ের জুড়ি নেই আর। বড় হয়ে পড়বে।
দেখবে মহাভারতের মতই অমৃত সমান।

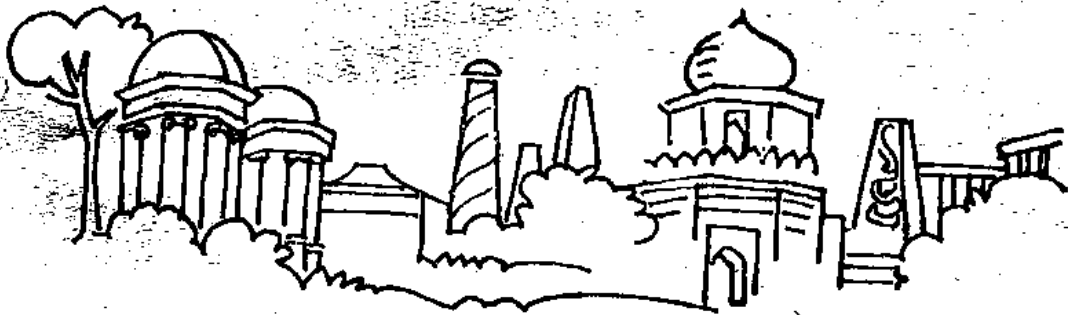
মাত্র তিরিশ বছরের জীবন। তাতেই কত কাজ। তিনটে চারটে
পত্রিকার সম্পাদক। গোটা পাঁচেক নাটক। নানা দিকে দান-দান।
মহাভারতের অনুবাদ। অজস্র সভা-সমিতির উদ্বোধনা। স্থার ওয়েলস
নামের একজন ইংরেজ বাঙালীদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিল খারাপ
রকমের। কালীপ্রসন্নই উঠে-পড়ে মিটিং ডাকলেন এর প্রতিবাদে। নই
যোগাড় করা হল দশ লক্ষ লোকের। বরখাস্ত হতে হল ওয়েলসকে।
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ায়ে নেমেছেন অনেকবার। তবু ইংরেজরা
কালীপ্রসন্নকে সম্মান না দিয়ে পারেন নি। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট
আর জাস্টিস অব পীস করেছিলেন কয়েকবার। কালীপ্রসন্ন সিংহ
পরিবারে জন্মেছিলেন বলেই সিংহ নন। তিনিই নিজেকে গড়ে
তুলেছিলেন সিংহের বল-বিক্রমে। এবার তাঁর জীবনের সবচেয়ে মজার
ঘটনাটা শোন।

কালীপ্রসন্নর আমলে এই কলকাতা শহরে এমন একদল ব্রাহ্মণ
পণ্ডিত বাস করতেন, যারা যে-কোন রকম প্রগতির বিরুদ্ধে টিকি
নাড়তে ওস্তাদ। কালীপ্রসন্ন যথার্থ জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের কাছে মাথা
নীচু করতে রাজী। কিন্তু নিছক টিকি-নাড়া টুলো পণ্ডিতদের উপর
হাড়ে চটা। আর টিকি-নাড়া পণ্ডিতদের জন্ম করার জন্মেই নিজের
বাড়ীতে বানিয়েছিলেন একটা মিউজিয়াম। সেখানে কি থাকতো
শুনলে হেসে লুটোপুটি খাবে তোমরা। থাকতো, সুরু, মোটা, পাতলা,
নধর, কুচকুচে, মুচমুচে, লম্বা, বেঁটে নানান রকমের টিকি। বড় বড়
ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে কেটে নেওয়া। প্রত্যেকটা টিকির গোছার
গায়ে আঁটা থাকতো লেবেল। আর লেবেলের গায়ে লেখা থাকতো
কোন টিকির কত দাম। কালীপ্রসন্ন বড় বড় ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে
ডেকে এনে যার যত দাম তা দিয়ে কিনে নিতেন এসব। দেখতে-

দেখতে এমন হল যে সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল, ‘টিকি কাটা জমিদার’। টুলো বামুনরা কালীপ্রসন্নর নাম শুনলে ভয়ে ঠক্ঠক! এই বুঝি কাচ করে কেটে নিলে তাদের কত সাধের টিকিরত্নটি।

এটা ফোলানো-ফাঁপানো গল্প। আসলে ঘটনাটা অগুরুকম। কালীপ্রসন্নর বাড়ীতে কোনও একটা ব্রত পালনের দিন একজন ব্রাহ্মণকে দান করা হয়েছিল একটা গরু। ব্রাহ্মণ বাড়ী যাবার পথে গরুটা বিক্রী করে দিয়েছিল এক কসাইকে। বাতাসে উড়তে উড়তে সে খবরটা একদিন কানে পৌঁছল কালীপ্রসন্নর। তিনি লোক পাঠিয়ে ডেকে আনলেন ব্রাহ্মণকে। আর রেগে গিয়ে নিজের হাতেই কেটে দিলেন তার টিকিটা।

এই ঘটনাটাই নানা মুখে ঘুরে ঘুরে, ডালপালা ছড়িয়ে হয়ে উঠেছিল ‘টিকি মিউজিয়াম’।



॥ মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই ॥

নাম শুনেই বুঝতে পারছো, এবারের বিষয়টা কেমন মজার। তোমাদের, আমাদের, তোমাদের বাবা-কাকার, আমাদের কাকা-জেঠার, সকলের জীবনেই স্কুল-কলেজের দিনের স্মৃতিটা বেশ মিষ্টি! যে-কোনো বিখ্যাত লোকের জীবনী পড়লে দেখতে পাবে, কত সব মজার কথা ছাত্রজীবন নিয়ে। অবশ্য সব কথাই যে মজার তা হয়তো নয়। কিছু কথা থাকে, যার ভেতরে চোখের জল।

কিছু স্মৃতি থাকে যার গায়ে দুঃখ-কষ্টের আঁচড়। ফুল ফুটেছে বাগানে।
রোদ উঠেছে আকাশে। তবু কি সব ফুল সুখী? কোনো কোনো
ফুলের মুখ গরীবের ঘরের মেয়ের মত শুকনো। কোনো কোনো ফুলের
সমস্ত পাগড়ি ভারী হয়ে আছে শিশিরে। তেমনি কিছু কিছু বিখ্যাত
মানুষও জন্মেছেন আমাদের দেশে, হাঁদের জীবনে স্কুল-কলেজটা
সুখের না হয়ে দুঃখের, দীর্ঘশ্বাসের। রবীন্দ্রনাথ যে স্কুল-পালানো
হলে, সে তো তোমরা জানই। তিনি বড় হয়েছিলেন নিজের জোরে।
স্কুল-কলেজের চেয়ে অনেক বেশী শিখেছিলেন নিজের আগ্রহ-ইচ্ছায়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ভাইপো। মস্ত বড় শিল্পী।
আবার মস্ত বড় লেখক। তোমাদের জন্তে কত যে ভাল ভাল বই
লিখে গেছেন, তার গোনা-গুনতি নেই। সে-সব বই এমন আশ্চর্য
ভাষায় লেখা যে, ছোটরাও পড়ছে, বড়রাও পড়ছে। ছোটরাও হাসি-
খুশীতে ফুলঝুরি, বড়রাও আনন্দে-আহ্লাদে ফোটা-তুবড়ি। অথচ
অমন জ্ঞানী-গুণী মানুষের কোনও দিন ভাল করে স্কুলের পড়াটা হল
না। হল না, তার কারণ মাষ্টার মশাই। ব্যাপারটা তাহলে শোনো।

অবনীন্দ্রনাথের যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন তাঁকে ভর্তি করে
দেওয়া হল নর্মাল স্কুলে। স্কুলে যেতে হবে শুনে সে কী কান্না তাঁর!
প্রথম প্রথম নিজে বসতেন বটে স্কুলের বেঞ্চে কিন্তু তাঁর মনটা বসত
না সেখানে। সে পালিয়ে-পালিয়ে, লাফিয়ে-রাঁপিয়ে বেড়াত ঠাকুর
বাড়ির বাগানে, পুকুরে, বটগাছের ছায়ায় পাখির পাড়ায়, উড়ে
পাখির মত। তবে অচেনা ছেলেরা যখন আস্তে আস্তে বন্ধু হতে
লাগল, তখন স্থির হল মনটা। এই স্কুলেই তাঁর ছবি আঁকার
হাতেখড়ি।

নর্মাল স্কুলে তখন ইংরেজীর মাষ্টার লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু। নামের
গোড়ায় লক্ষ্মী থাকলে হবে কি, ছিলেন বড় কড়া ধাতের মানুষ।
রাগলে যেন দক্ষযজ্ঞে শিব।

একদিন ক্লাসের পড়া নিচ্ছেন। ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন—
বল তো, পি, ইউ, ডি, ডি, আই, এন, জি, কি হয়। ছাত্ররা বোবা।

অবনীন্দ্রনাথও। হয়তো ভয়ে, উত্তর দিলেন না কেউ, দেখে মাষ্টার মশাই-ই বলে দিলেন উত্তরটা।

—পাড়ি।

উত্তর শুনে বাচ্চা ছেলে অবনীন্দ্রনাথ অবাক। একি! এ তো ভুল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—স্মার! ওটার উচ্চারণ পাড়িং নয়। পুড়িং। আমরা রাত্রি-বেলায় রোজই পুড়িং খাই।

এক ফৌটা ছেলের মুখে তাঁর মত জাঁদরেল মাষ্টারমশায়ের ভুল ধরা শুনে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু রেগে-মেগে হয়ে গেলেন চিতাবাঘ।

—দাঁড়াও বেঞ্চের উপর।

অবনীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন। আর তাঁর পিঠের উপর পড়তে লাগল স্যাঁট-স্যাঁট বেতের চাবুকের মার।

—বলো, পুড়িং নয়, পাড়িং।

অবনীন্দ্রনাথ মিথ্যে বলতে নারাজ। তাই আবার মার। তাতেও আশ মিটল না মাষ্টার মশায়ের। তিনি হুকুম দিলেন—টানা-পাখার দড়িতে ছুটির পরও বেঁধে রাখ ওকে।

স্বাস্। তার পরের দিন থেকেই ইস্কুলে ইস্তফা। বাবা গুণেন্দ্রনাথ রাগে গরগর করতে করতে হুকুম দিলেন, অবন যেন কাল থেকে আর ঐ স্কুলে না যায়।

অবনীন্দ্রনাথকে কখনো পাঠশালায় পড়তে হয়নি। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু পড়েছিলেন। কেননা তিনি পাড়াগাঁয়ের ছেলে। গ্রামের নাম বোড়াল। রাজনারায়ণ বসুর নাম তোমরা বড় হয়ে শুনবে।

তখনকার পাঠশালার ছাত্রকে শাস্তি দেবার কত রকম যে আয়োজন ছিল, এখন শুনলে হাসি পাবে। কোনটার নাম হাত-ছড়ি, কোনটার নাম ত্রিভঙ্গ, কোনটা চ্যাংদোলা। তবে সবচেয়ে মজার নাম, নাড়ুগোপাল।

হাতছড়ি হল, পাতা থাকবে ডানদিকের হাত। তার উপর সপ্-

সপা-সপু ছড়ি। চ্যাংদোলা হল, বড় বড় জোয়ান ছেলেরা গিয়ে
 অপরাধীকে ধরে আনবে হাতে-পায়ে ধরে কুলিয়ে। চ্যাংদোলা মাত্রে
 ছাত্র ঐ অবস্থায় শূণ্ণে কুলবে আর শিক্ষক ঠেঙাবে। ত্রিভঙ্গ হল,
 ক্যালেন্ডারের ছবিতে তোমরা যেভাবে কৃষকে দাঁড়িয়ে থাকবে
 দেখেছো, সেইভাবে বেকে দাঁড়াতে হবে। সেই অবস্থায় এক হাতে
 থাকবে যে কোন একটা ভারী জিনিষ। তখন একটুকুও নড়াচড়া
 চলবে না। নড়লেই কোমরের কাপড় তুলে চাবুক। আর নাহ
 গোপাল হল, দু'পা আর এক হাত একজায়গায়। দ্বিতীয় হাত
 শূণ্ণে। তার উপরে থান ইট। সে হাতটিকে নড়ানো চলবে না।
 নড়লেই উত্তম-মধ্যম। এছাড়াও আরও একটা জ্বালাময় শাস্তি
 বিধান ছিল, গায়ে বিছুটি (বা বিছুতি) পাতা ঘষে দেওয়া। কিছুটা
 পাতার রোয়া শরীরের যেখানে লাগে, ফুলে ওঠে মাংস আর এমন
 অসহ্য তার জ্বালা, মনে হবে গায়ের ছাল-চামড়া কেটে ছাড়িয়ে
 নিলে, তবে শাস্তি।

পাঠশালা পেরিয়ে কলকাতার স্কুল। রাজনারায়ণের বয়স তখন
 সাত। স্কুলের নাম শম্ভু মাষ্টারের স্কুল। বৌবাজারের এক অন্ধকার
 গলিতে। শম্ভু মাষ্টার নিজে ফোঁটা-তিলকধারী গোঁড়া হিন্দু। অথচ
 ইংরেজী শেখানোর জন্তে মাষ্টার রেখেছেন এক সাহেবকে। নাম
 গ্রীক। সাহেব কতটা ইংরেজী শেখাতেন সেটা বড় কথা নয়। তবে
 লালমুখো সাহেব থাকলে আদর-কদর-গুমোর বাড়ে স্কুলের। সেই
 গ্রীক সাহেব পড়াতেন যত, তার চেয়ে চাবুক নাচাতেন বেশী। আর
 চাবুক মারতেন তার চেয়েও বেশী। শিক্ষাদানের চেয়ে শাস্তিদানেই
 তার যত আগ্রহ-আড়ম্বর। আসলে গ্রীক সাহেবের ইংরেজী জ্ঞানের
 তফিলটা ছিল ফাঁকা। তবে মাষ্টারমশাই হলেই হাতে বেত থাকবে,
 এটা তখনকার কালের একটা নিয়ম।

হেয়ার সাহেবেরও ছিল। হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম তখন,
 স্কুল সোসাইটিজ স্কুল। রাজনারায়ণের যখন চোদ্দ বছর বয়স, তখন
 চলে এলেন এইখানে। পড়া বলতে বা করতে না পারলে, ছাত্রের

পিঠে বেতের বাজনা বাজাতেন ডেভিড হেয়ারও । প্রত্যেক শনিবার তাঁকে দেখাতে হত হাতের লেখা । প্রত্যেক শনিবারে অনেক ছাত্রকে বাড়ি ফিরতে হত আধ-মরা হয়ে ।

রাজনারায়ণের হাতের লেখা ভাল । তাই নিজে বেত খাননি । কিন্তু যারা খায়, তাদের দশা দেখে রাজনারায়ণের মনে দুঃখ, চোখে জল । কী করে বন্ধ করা যায় এই ‘বেত্রচালৈষণা’ ? ভেবে ভেবে এক বুদ্ধি বের করলেন রাজনারায়ণ । একদিন ইংরেজীতে একটা গল্প লিখে পড়তে দিলেন হেয়ার সাহেবকে । হেয়ার সাহেব সে গল্প পড়ে হেসেছিলেন, না কেঁদেছিলেন তা আমাদের জানা নেই । তবে গল্পটা ছিল মজার । উত্তম-মধ্যম বেতের মার খেয়ে একটি ছাত্র কীভাবে আত্মহত্যা করল, তাই নিয়েই গল্পটা ।

এরপর কলেজ । রাজনারায়ণ তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র । অঙ্কে খুব কাঁচা । অঙ্কের বা গণিতের নাম শুনলেই অর আসে, বুক কাঁপে আতঙ্কে । অঙ্ক নেন রিজ্ সাহেব । রিজ্ সাহেবের ক্লাস আরম্ভ হবে শুনলেই অর্ধেক ছাত্র কলেজের রেল টপকে পালিয়ে যায় যে-যেদিকে পারে । রাজনারায়ণও পালাতেন । তবে কলেজের বাইরে নয় । সংস্কৃত কলেজের দোতালার হলঘরে । অন্য সব ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে লুকিয়ে থাকতেন গুটিশুটি হয়ে । অঙ্কে আতঙ্ক ছিল রাজনারায়ণের আরেক সহপাঠীর । নাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

অঙ্কের পরেই বাংলা । তখনকার ছাত্ররা ইংরেজীতে ইট । বাংলায় কাদা-মাটি । বাংলা ভাষা যেন এক ভীষণ ভাষা, এমনি ভয় তাকে । বাংলার শিক্ষক ক্লাস নিতে এলে, চুলোয় গেল পড়া । দল বেঁধে ছাত্ররা শুরু করে দিত গল্পগুজব ।

হিন্দু কলেজে কিছুদিনের জন্যে শিক্ষক হয়ে এসেছেন রামকমল সেনের বাড়ির রাঁধুনি ব্রাহ্মণ । তিনি বাংলা পড়াতে ক্লাসে ঢোকা মাত্রই ছেলেরা শুরু করে দিলে

—স্মার, অমুক তরকারিটা কী ভাবে রাঁধতে হয় ?

—স্মার, কোর্মা-কালিয়া রাঁধতে হয় কেমন করে স্মার ?

—জার, মুড়িঘণ্টে কি আগে ভেজে নিতে হয় মুড়োটাকে?
 এই রকম যে-কোন একটা প্রশ্ন করলেই রাধুনি বাবুন
 নিজের রান্নার দক্ষতার গল্পে মেতে উঠতেন। তারপর এক সময় সে
 উঠতো পিরিয়ড-শেষের ঘণ্টা। ব্যাস! বাংলা পড়ার দক্ষ-রক্ষা।
 আনন্দ ছাত্রদের মনে।

একটু আগে ডেভিড হেয়ারের কথা বলেছি। তাঁর হাতে চাকর
 কথা শুনেছ। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের ভিতরকার স্নেহ-মমতার নদী-কর
 কথা বলা হয়নি। দেবতার মত মানুষ ছিলেন তিনি। ছাত্রদের কি
 ভাল হবে, এই চিন্তাতেই ডুবে থাকতেন দিনরাত।

ছাত্র রামতনু লাহিড়ীর অশ্রুথ করেছে। ওলাউঠা। কথাটা কত
 পেল হেয়ারের। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ছাত্রের বাড়িতে, লালদীঘির কা
 থেকে সোজা চৌটে। হেয়ারের সঙ্গে সব-সময়েই থাকতো ওফুফু-পু
 ত্রিমি নিজের হাতেই 'ফুলে' নিলেন ছাত্রের চিকিৎসার ভার। প্র
 য়েদিন এসে দরজার কড়া বাঁড়ছেন, বাড়ির লোকেরা সাইকেল
 হারেলী শব্দে ভেদে নিয়েছিল, বুঝি কোনো মাতাল ঘোরা। তখন
 কালে গোরা মেঘরা রাস্তাবিরোধে লম্বাচরীতের ওপর অত্যাচার
 চালাতো। সেই ভয়ে কেউ দরজা খুলছিল না। ডেভিড হেয়ারকে
 অনুরোধ করে নিয়ে হারেলীরা বদলে ত্রিখরীতে গলে উঠলেন

—আমি মজা, ছাত্র হেয়ার সাহেবের জামা।

দরজা খুলে গেল আবার।

হেয়ার সাহেবের আনন্দে উদ্ভাসিত বাঁশ, চন্দ্রাবলম্ব দেব। একই
 আমলি ওকল সাঙ্গি দেখা করছে, সন্ধ্যাবেলা। ছাত্র সাইকল
 বহি। চন্দ্রাবলম্ব উদ্ভাসিত বাঁশ। হেয়ার সাহেবের, দেবদেব।
 লোকেরা অনেক কালে আগলেন মিষ্টি। নিজে চন্দ্রাবলম্ব
 বাঁশবালির।

বুঝি বাঁশবাল।

—বাবা, হেয়ার সাহেবের দরজা খুলে আসি সাহেবের।
 —মা, আসি সাহেবের আসি সাহেবের।

—না হে না। রাস্তায় গোরার আছে। একলা যেতে পারবে না।

হাতে নিলেন একটা লাঠি। চললেন ছাত্রকে এগিয়ে দিতে, পটুয়াটোলায়। বৌবাজারের কাছে এসে চন্দ্রশেখর বললে

—আপনি আর আসবেন না।

—না, চল তোমাকে মাধব দত্তের বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

চন্দ্রশেখরকে গোলদীঘির কাছে ছেড়ে দিলেন তিনি। চন্দ্রশেখর বাড়িতে পৌঁছে জামা-কাপড় ছাড়বে, এমন সময় দরজায় ধাক্কা। বাড়ির লোক দরজা খুলে দেখে হেয়ার সাহেব। চোখে-মুখে উদ্বেগ।

—Is chunder in ?

অর্থাৎ, চন্দ্র কি ফিরেছে ?

হেয়ার ছিলেন এমনি মাষ্টার মশাই।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রেসিডেন্সীর ছাত্র। তাঁর সহপাঠীর নাম ললিতবল্লভ শীল। তিনি অবশ্য নিজের নাম লিখতেন অকৃতভাবে। N. B. Seal, অর্থাৎ নলিতবল্লভ শীল। রো সাহেব ছিলেন কলেজের একজন জাঁদরেল প্রফেসর। তিনি বলতেন, ও হল Nota Bene Seal. Nota Bene কথাটা ল্যাটিন। মানে হল বিশেষ দৃষ্টব্য। ঐ যে আমরা যার সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে লিখি N. B. সেই ললিতবল্লভের একটা মাত্র গুণ ছিল মুখে মুখে ছড়া বানানো। কলেজে তখন বাংলার অধ্যাপক হলেন রামচন্দ্র মিত্র। তিনি একদিন ক্লাসে এসে হিন্দু ছাত্রদের গোমাংস খাওয়া নিয়ে একটা শ্লোক আওড়ালেন। শ্লোকটা লিখেছেন উইলসন সাহেব। শ্লোকটা হল

O ye ; Hindus, have ye heard

What hath recently occurred ?

The Hindu eateth beaf

The Hindu eateth beaf.

ললিতবল্লভ তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন

—স্মার, এর বাংলাটা বলবো ?

—বল ।

—শুনরে ভাই হিন্দুগণ

কি হয়েছে কীর্তন,

গোকু খেয়েছে হিঁছু

গোকু খেয়েছে হিঁছু ।

অনুবাদ শুনে রামচন্দ্র খুব খুশী ।

এই রামচন্দ্র ছিলেন এক অদ্ভুত শিক্ষক । সাহেব অধ্যাপকরা মতে করতেন, তিনি খুব বড়-সড় মাপের পণ্ডিত । কিন্তু ছাত্ররা মনে করতে ঠিক তার উল্টো ।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য রামচন্দ্রেরই ছাত্র । নানা কারণে শিক্ষকের উপর রাগ করে তিনি এক আবেদন-পত্র লিখে বসলেন একদিন । তার রামচন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে অযোগ্যতার অনেক কিছু নজির-প্রমাণ তারপর ক্ষেত্রনাথ যোগাড় করতে লাগল ছাত্রদের স্বাক্ষর । হেমচন্দ্র পড়েন ক্ষেত্রনাথের চেয়ে নীচের ক্লাসে । তবু নীচের ক্লাসের ছেলেরা সেই নেওয়া হল । তারপর আবেদন-পত্র গেল অধ্যক্ষ সার্টক্রিফের কাছে । আবেদন পত্র পড়ে সার্টক্রিফ রেগে লাল । তিনি ক্ষেত্রনাথ কলেজ থেকে ছাঁটাই করার হুকুম দিলেন । সার্টক্রিফ সাহেব যে এর লকলকে আগুনে জ্বলে উঠবেন, কেউ ভাবেনি । ক্ষেত্রনাথ আ ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র, যখন পড়তেন হাবড়া স্কুলে সাহেবকে জল করার আর কোনও উপায় না দেখে ক্ষেত্রনাথ পি ধরলেন ভূদেববাবুকে । ভূদেববাবু এসে অনেক চেষ্টা করলেন সাহেব মন ভেজানোর । ভিজল না, গলল না । নিজের সিদ্ধান্তে পি পাহাড় । তখন ভূদেববাবু গিয়ে ধরলেন খোদ রামচন্দ্রকে । রাম সব কথা শুনে তখনই মাপ করলেন ক্ষেত্রনাথকে । শুধু তাই নয়, নি সার্টক্রিফের কাছে গিয়ে জানালেন মিনতি ।

—স্মার, ছেলেরা খোঁকের মাথায় অগ্রায় করে কেনো এবারের মত ক্ষমা করে দিন ।

রামচন্দ্র বলতেই সাহেব জল।
পড়ার ক্লাস নিতে নিতে রামচন্দ্র মাঝে মাঝেই করতেন কি
ছেলেদের শেখাতেন কিভাবে কবিতা লিখতে হয়। দ্বিপদী শেখানোর
জগ্রে নিজে বলতেন একটা লাইন প্রথমে। সেটার পাদপূরণের দায়িত্ব
পড়তো ছাত্রদের ওপর। একবার এমনি একটা পদ বলেছেন। শোনা
মাত্রই উঠে দাঁড়াল ললিতবল্লভ। শিক্ষক রামচন্দ্রের দিকে তর্জনী
উচিয়ে, যেন কোনো রাগী মুনি অভিশম্পাত দিচ্ছেন কাউকে, এমনি
ভঙ্গীতে বলে উঠল—

পরম পণ্ডিত তুমি ভারত ভিতর।

বলা মাত্রই ক্লাস জুড়ে হাসির ঝড়। রামচন্দ্র সম্বন্ধে যার মুখে যত
রাগ, তার মুখে তত হাসি।

রামচন্দ্র মিত্র মানুষটা সত্যিই বড় অদ্ভুত চরিত্রের। অনেক মজার
মজার গল্প আছে ঐক নিয়ে। ধরো কোনো ছাত্র একদিন এসে প্রশ্ন
করল

—স্যার! পৃথিবীটা যে গোল, কী করে মনে রাখবো?

—একী একটা কঠিন কাজ? রসগোল্লা খাবার সময় তার
গোলাকার চেহারাটার ধ্যান করবে।

—স্যার! ভূগোল শেখার একটা সহজ উপায় বলে দেবেন?

—নিশ্চয়ই। শোনো, ভূগোল মনে রাখার সবচেয়ে সোজা উপায়
হল, স্টুয়ার্ট-এর জিওগ্রাফিকানা ২০ আনা মুখস্থ করে ফেলা।
পরীক্ষার সময় যদি ৪ আনা ভুলে যাও তাহলেও ১৬ আনা মনে
থাকবে।

—স্যার! কী করে ভাল ‘কম্পোজিশন’ লেখা যায় একটু বলে
দেবেন?

—অবশ্য। ধরো প্রকৃতির বর্ণনা লিখতে বসেছো। তখন সুশীতল
সমীরণ এই ছুটি কথা অতি-অবশ্য ব্যবহার করবে। তবে যদি সাধু
ভাষা মনে না আসে, তাহলে বসিয়ে দেবে—ঠাণ্ডা বাতাস। তারপর
ধরো লিখতে বসেছ কলস শকট। কিন্তু মনে পড়ছে না কোন স

লিখতে হবে। তখন কলস না লিখে ঘট লিখে দেবে। ব্যাস! কল
গেল লেঠা।

—স্মার! এই বইটার কোন্ কোন্ অংশ ভাল করে পড়তে হবে
একটু বলে দেবেন?

—প্রথম পাতাটা পড়বে। দ্বিতীয় পাতাটা পড়বে। তৃতীয়
পাতাটা পড়বে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম
একাদশ...

এইভাবে গোটা বইটার সবক'টা পাতার নাম বলে চললেন
রামচন্দ্র। ছাত্রের মুখ লজ্জায় লাল। কেটে পড়তে পারলে বাঁচবে
মনের ভাব-গতিক এমনি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে। ঠাকুরবাড়ির ছেলো।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ভারতবর্ষের প্রথম আই. সি.
এস। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি ছিলেন এই রামচন্দ্র মিত্রের ছাত্র।
উপরে রামচন্দ্রের যেসব মজার কথা শুনলে তার অনেকটা
সত্যেন্দ্রনাথেরই বাল্যকথা থেকে যোগাড় করা।

ছেলো! মানে ছাত্ররা ক্লাসে হৈ-হট্টগোল বাধিয়েছে। কিছুক্ষণ
বারাণ শুনছে না। রামচন্দ্র তখন নানা রকম বিকট মুখভঙ্গী করে তাঁর
দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে চক্ খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লিখতেন—
Silence ! Silence ! লিখেই গম্ভীর গলায় হাঁক দিতেন।

—এখন কে গোল করবে করুক দেখি !

সত্যিই আর গোল করত না কেউ এরপর।

একবার ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে গেছেন বোটানিক্যাল গার্ডেন।
বাগানের ভিতরে একটা জায়গায় ছিল গাছের ঘর। দলবল নিয়ে
যেই সেখানে ঢুকতে যাবেন, অমনি কোথা থেকে এক লালমুখা
সাহেব কালো মহিষের মত তেড়ে এলেন গর্জন করে।

—Who the devil are you ?

সাহেবের হুকুরে রামচন্দ্রের হাড়ে-মাসে কাঁপুনি। ভয়ে-ভয়ে খুঁ
বিনীত গলায় উত্তর দিলেন

—Professor Ramchandra Mitra, Professor Presidency College.

সাহেব তবুও গর্জায়

—D...your Professor.

রামচন্দ্র বুকলেন বেগতিক। দলবল নিয়ে সরে পড়লেন সেখান থেকে। কিছুটা দূরে এসে ছাত্রদের বললেন

—Let us forget & forgive. Let us exercise the Christian Virtue of forgiveness.

রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য যে আবেদন-পত্র লিখেছিলেন তাতে হেমচন্দ্রও নাম সই করেছিলেন ভালো-মন্দ না বুঝে। তারপর সেই আবেদন-পত্র গিয়ে পৌঁছল অধ্যক্ষ সার্টক্লিফের কাছে। আবেদন-পত্র পেয়ে সার্টক্লিফ তো রেগে অগ্নিশর্মা। তিনি জানিয়ে দিলেন দলের পাণ্ডা ক্ষেত্রনাথকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে কলেজ থেকে। হেমচন্দ্রকে ডেকেও তিরস্কার করলেন তিনি। করারই কথা। এই হেমচন্দ্রকে এক সময়ে স্কুলের মাইনে পর্যন্ত যুগিয়েছেন তিনি মাসে মাসে। হেমচন্দ্র ভয়ে আধখানা। এখন ছাত্রদের একমাত্র ভাবনা, কী করে ক্ষেত্রনাথকে বাঁচানো যায়। ক্ষেত্রনাথ একসময়ে পড়তেন হাবড়া স্কুলে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সকলে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাঁর কাছে। ভূদেববাবু এসে ধরলেন রামচন্দ্রকে। আপনি ছাত্রদের ক্ষমা করে দিন। রামচন্দ্র মাটির মানুষ। তাঁর জন্তে কোনও ছাত্রের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে, এ তিনি সইতে পারছিলেন না। ভূদেববাবুর আর্জিতে রাজী হয়ে গেলেন তখন। তিনি নিজে গিয়ে সার্টক্লিফকে অনুরোধ জানানালেন, ক্ষেত্রনাথকে ক্ষমা করে দিতে। রামচন্দ্রের উদারতায় ক্ষেত্রনাথ বেঁচে গেলেন সে-যাত্রায়। ছাত্ররা বুকল, কত বড়-হৃদয়ের মানুষ এই রামচন্দ্র। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল তখন খুব নিবিড়। ছাত্রদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন শিক্ষকরা। সেবার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষা দেবার কথা হেমচন্দ্রের। কিন্তু সময়ের অভাবে হেমচন্দ্র

ভাল করে তৈরী হতে পারলেন না। পরীক্ষা দিলেন বটে, কিন্তু বি. এল উপাধির জায়গায় জুটল এল. এল। অধ্যক্ষ সার্টক্রিফের বড় শ্রিয় ছাত্র হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের ফলাফল দেখে মনে মনে বাথা পেলেন তিনি। যথেষ্ট সময় পেলে হেমচন্দ্র যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতো, এ তিনি জানেন। একদিন সরাসরি ডেকে পাঠালেন হেমচন্দ্রকে। হাতে তুলে দিলেন একটা চিঠি। বললেন, এটা নিয়ে দেখা করো তোমার পরীক্ষকের সঙ্গে। হেমচন্দ্র চিঠিটা নিয়ে চলে এলেন বাড়িতে। মনের মধ্যে উশখুশ করছে কোতুহল! কী লেখা আছে চিঠিতে? একবার দেখে নিলে হতো। ভাবতে ভাবতে সত্যিই ছিঁড়ে ফেললেন খামটা। চিঠি পড়ে হতবাক। সার্টক্রিফ তার পরীক্ষককে জানাচ্ছেন, হেমচন্দ্রের খামটা যেন দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করে দেখা হয়। হেমচন্দ্রের চোখের কোণে চিক্চিক্ করে উঠল জলের ফোঁটা, দুটো কারণে। প্রথমটা, সার্টক্রিফের প্রতি শ্রদ্ধায়। দ্বিতীয়টা, চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন বলে। হেঁড়া চিঠি নিয়ে পরীক্ষকের কাছে যেতে লজ্জা হল হেমচন্দ্রের।

পরে অবশ্য অন্ততাবে এল. এল থেকে বি. এল-এ পৌঁছেছিলেন তিনি। সেই বছরই নতুন নিয়ম চালু হল, এল. এল-রা ৩০ টাকা ফি দিলেই বি. এল হয়ে যেতে পারবে।

সার্টক্রিফের মত দরদী মনের শিক্ষক তখনকার স্কুল-কলেজে আরও ছিলেন অনেক। রাজনারায়ণ বসু যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন গণিতের অধ্যাপক ডি. এল. রাজ। চমৎকার মানুষ। বিনা দোষে ছাত্রদের গায়ে হাত দেন না। দোষের মধ্যে দুটি। এক হল, নেপোলিয়ানের নামে মুখ দিয়ে লাল গড়ায়। আর একটা হল, ইরাজী উচ্চারণটা গগুগোলের। ছারপোকা কামড়িয়েছে। বলবেন, —বাগ্‌স। তা না বলে চীৎকার করে উঠলেন—বোগ্‌স বোগ্‌স। এমন সহজ সরল মানুষকেও নাকি ভয় পেতো ছাত্ররা। অঙ্কের ক্লাসের ঘণ্টা বাজলেই কলেজের রেলিং টপকে যে দিকে পারে ছুট। রাজনারায়ণ বসু কখনো রেল টপকাননি বটে, কিন্তু ক্লাস পালিয়ে লুকিয়ে থাকতেন সংস্কৃত কলেজের দোতলার হলে, অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে।

একদিন ক্লাস হচ্ছে অঙ্কের। রাজনারায়ণের অঙ্কের দিকে চোখ নেই। সাদা খাতার পাতায় কেটে চলেছেন আঁকিবুকি। এক সময় কখন যেন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং রাজ সাহেব। হঠাৎ কাঁধে হাতের চাপ পড়তেই চমকে তাকালেন রাজনারায়ণ। মাথার উপরে ছুটি স্নেহ-বিহ্বল চোখ। রাজনারায়ণ তাকাতেই একটি স্নেহ প্রশ্ন

—তুমি সাহিত্যে এত ভাল, গণিতে নয় কেন?

এই আশ্চর্য মুহূর্তটিকে রাজনারায়ণ ভুলতে পারেননি কোনদিন।

এমনি আর একজন শিক্ষক হলেন হ্যালফোর্ড। ব্যাকরণে আর শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত। তাই স্বভাবে কিছুটা নীরস। নিজে নীরস হলে কী হবে, ছাত্রদের কাছে ছিলেন আমোদের উৎস। কথা বলতেন ভারী ভারী ইংরাজী শব্দে। একদিন স্কুলের অধ্যক্ষ তাঁকে গিয়ে অনুরোধ করলেন—আজ স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ হবে। আপনি যদি সভাপতি হন, খুব ভাল হয়।

হ্যালফোর্ড-এর উত্তর

—I am a vegetable being averse to locomotion.

অর্থাৎ, আমি কোথাও যাই না। আমি চলৎশক্তিহীন একটি উদ্ভিদ। এই হ্যালফোর্ডের একটা নোটবুক ছিল, যার উপর ছাত্রদের খুব লোভ। নোটবুকটা নিয়েই ক্লাসে আসতেন তিনি। একদিন টেবিলে নোটবই রেখে সাহেব গেছেন বাথরুমে। এই সময় রাজনারায়ণ নোটবইটা তুলে নিলেন হাতে। পাতা ওপ্টাতেই চোখে পড়ল আশ্চর্য সব লেখা।

—স্নেক, সু-নেক, নাক, নাগ।

সংস্কৃত নাগকে এইভাবে মিলিয়েছেন ইংরেজী স্নেকের সঙ্গে।

আর এক পাতায়

ঐক শব্দ বোকাকাস হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার বোকা হাগল।

আর এক পাতায় চীন সম্রাটকে নিয়ে কবিতা।

কার্পেন্টার রিচার্ডসন তখন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পড়াতে

শেক্সপীয়র। মেকলে একবার শুনেছিলেন তাঁর আবৃত্তি। বলে-
ছিলেন, ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আপনার
আবৃত্তি কখনো ভুলব না।


এতবড় পণ্ডিত অথচ ছাত্রদের সঙ্গে কী অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তা নইলে
কী রাজনারায়ণ আত্মচরিতে লিখতে পারতেন, কাণ্ডেন সাহেব ইয়ার-
গোছের লোক ছিলেন।

রিচার্ডসন-এর খ্যাতিতে মনে জ্বালা ধরতো অন্য কোনও কোনও
শিক্ষকের। ক্লিফট সাহেব অঙ্ক আর সাহিত্যের শিক্ষক। তাঁর সামনে
কেউ রিচার্ডসনের গুণ গাইলেই তিনি বলতেন

—A ship in India is but a boat in England. অর্থাৎ
ভারতবর্ষে যাত্রাহাজ, ইংলণ্ডে সেটা একটা নৌকো মাত্র।



॥ লালাবাবুর কাহিনী ॥

আমাদের মাসগুলো দুটো পক্ষে ভাগ করা। শুক্লপক্ষ আর
কৃষ্ণপক্ষ। একটাতে অন্ধকার কেটে কেটে ফুটেছে আলো। আর
একটা আলোকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে। আমাদের
সমাজ-সংসারেও ঠিক এমনি দুটো পক্ষ আছে। চোখে পড়বে, একটু
গভীর চোখে তাকালেই। একদল মানুষ চলেছে টাকাপয়সা রোজগার
করে ভোগের দিকে। এই রকম খাব, এই রকম পরব, এই রকম বড়
ওড়াবো, উড়বো, মানুষকে শাসন করবো, শোষণ করবো, 

দেখাবো, ধরা হবে হাতের সরা। আরেক দল মানুষ, চারপাশে জল
মাকখানে পদ্মফুলের মতো, বসে আছেন অগাধ ধন-রত্ন, সোনা-দানা,
সুখ-সম্পদের মধ্যে। কিন্তু মনে নেই সুখ। চোখে নেই ঘুম। সুখ যেন
শজারুর কাঁটা। গায়ে বিঁধছে কেবল। কখন কি করে সিন্দূকের
ডালা খুলে সব সঁপে দেবেন গরীব-দুঃখী মানুষের হাতে, সেই চিন্তাটাই
দিনরাতের ধ্যান। মানুষের মঙ্গলকামনাই সকাল-সন্ধ্যার জপতপ।
তোমাদের কাছে আজ এমন একটা গল্প বলবো, যেখানে দেখতে
পাবে অমাবস্তা আর পূর্ণিমা একই সংসারে। এক পুরুষ করে গেল
দোহন। তার পরের পুরুষ, দান।

পলাশী যুদ্ধের পর একদল মানুষ ইংরেজদের খুব কাছাকাছি এসে,
নানারকম গোপন পথে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গী হয়ে, পরে
ইংরেজদেরই দয়া-দাক্ষিণ্যে রাতারাতি হয়ে উঠেছিলেন অর্থে, যশে,
ক্ষমতার দাপটে সমাজের মাথা-মাতব্বর। তেমনি একজন মানুষ
হলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

তখন হেষ্টিংসের আমল। বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল তিনি।
তার দু-হাতের আশীর্বাদ পেয়ে জনার্পাচেক বাঙালী লাখপতি হয়ে
উঠলেন রাতারাতি। কোন কোন ইতিহাসের পাতায় তাঁদের পাঁচ-
জনকে নাম দিয়েছে, পঞ্চপাণ্ডব। এই পঞ্চপাণ্ডব হলেন, শোভা-
বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব, বড়বাজারের কাশিনাথ, শ্রামবাজারের
কৃষ্ণকান্তবাবু, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ আর ক্রাইভ স্ট্রীটের দেবী
সিংহ। সেকালের বনেদী জমিদাররা আবার ঠাট্টা করে এই পঞ্চ-
পাণ্ডবকে আখ্যা দিয়েছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পোয়াপুত্র। শুনে
অবাক লাগতে পারে। জমিদাররা ঠাট্টা করছে জমিদারকে? কারণ
ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের কথাই ধরা যাক। জন্ম মুর্শিদাবাদের কান্দীতে।
ঠাকুরদা হরকৃষ্ণ সিংহ। চাকরী করতেন নবাব-সরকারে। বাবার নাম
বিহারী। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁরই ছোট ছেলে। গঙ্গাগোবিন্দ বড়সড়
হয়েই কানুনগো-র চাকরী পেয়ে গেলেন রেজা খাঁ-র অধীনে। রেজা
খাঁ তখন বাংলার সুবেদার। হেষ্টিংস তখন কাশিমবাজারে। সেখানকার

রেশম-কুঠীর রেসিডেন্ট। সেই সময়েই গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে আলাপ-দোস্তি, গলায়-গলায় ভাব। তারপর বদল হল সরকার। ইংরেজরা হয়ে উঠল বাংলা-মুলুকের হর্তা-কর্তা। হেষ্টিংস বসলেন রাজসিংহাননে। চাকরী গেছে রেজা খাঁ-র। রাজা রাজবল্লভ দেওয়ান। হেষ্টিংস-এর মনে পড়ে গেল গঙ্গাগোবিন্দের কথা। নানান সময়ে গোপনে অনেক খবরাখবর জানিয়ে গেছেন কলকাতায় ছুটে এসে। আহা, মানুষটা বড় ইংরেজ-দরদী। আমাদের উপকারী বন্ধু। হেষ্টিংস তাঁকে দিয়ে দিলেন সহকারী দেওয়ানের চাকরী। কিছুকাল যেতে না যেতেই গঙ্গাগোবিন্দকে করে দিলেন রাজস্ব-বিভাগের সর্বেসর্বা। তারপর আরো উঁচু সিঁড়িতে পা। কলকাতায় রেভিনিউ কাউন্সিলের দেওয়ান। সেটা ১৭৭৪। বেশ দিন কাটছিল গঙ্গাগোবিন্দের, সুখে শান্তিতে। বানের জলের মত, জলের মাছের মত বেশ টাকা-পয়সাও আসছিল খলখলিয়ে। ঘুষের টাকা। চোখ রাঙিয়ে লুট-করা টাকা। এমন সময়, সুখের চাকরিটার বয়স হয়েছে যখন মোটে এক বছর, গোল বাধালে মরসন। লোকটা হেষ্টিংসের বিপক্ষ দলের লোক। হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিলে গঙ্গাগোবিন্দ ঘুষের কারবারি। হেষ্টিংসের মুখে কালি। চাকরী গেল গঙ্গাগোবিন্দের। এর পরের বছরই মারা গেল মরসন সাহেব। মরতে-না-মরতেই হেষ্টিংস আবার তুলে দিলেন তাঁর হাতে দেওয়ানির দায়-দায়িত্ব। তখন চলেছে পাঁচশালা বন্দোবস্ত। জমিদারের হাতে জমির স্বত্ব মাত্র পাঁচবছর। পাঁচ বছর পরে যিনি বেশী খাজনা যোগাতে রাজী হবেন চাষীদের রক্ত শুষে, জমিদারী যাবে তাঁর দখলে। জমিদারদের প্রাণ-ভোমরা তখন গঙ্গাগোবিন্দের মুঠোয়। রাখলেও তিনি, মারলেও তিনি। জমিদারদের যম। এমন মানুষকে ভয় না করে উপায় আছে। সত্যি বলতে কি, লোকে আদত বাঁশ গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংসের চেয়ে বেশী ভয় করতো তাঁর এই কঞ্চিকে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তখন নামের ডাকে গগন ফাটে। সেই কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত তোয়াজ করে চলেন গঙ্গাগোবিন্দকে। একবার বিবাদ বাধল নিজের ছেলে শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে। বাংলাদেশে

এমন কে আছে, যিনি মধ্যস্থ হওয়ার যোগ্য ? আছেন একজনই ।
তিনি গঙ্গাগোবিন্দ । কৃষ্ণচন্দ্র লিখে পাঠালেন—

দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য
কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ ।

ঘুম নিতে নিতে গঙ্গাগোবিন্দের স্বভাবটা হয়ে উঠেছিল বদখত ।
সামান্য ব্যাপারেও ঘুম না নিয়ে তাঁর চলত না । এছাড়া ঝোপ বুকে
কোপ মারাটায় খুব রপ্ত । ছলে-বলে একদিন ছিনিয়ে নিলেন নাটোর
রাজবংশের বেশ কয়েকটা পরগণা । আরেক দেওয়ান দেবী সিং-এর
সঙ্গে যোগসাজশে দিনাজপুরের জমিদারীও হাতিয়ে নিলেন বেশ
খানিকটা । হেষ্টিংস-এর যখন বিচার হয় বিলেতে, তখন এইসব
অপরাধের কথা উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে । হেষ্টিংস-এর পর কর্নওয়ালিস ।
তিনি এসে বাধ্য করলেন গঙ্গাগোবিন্দকে, নাটোরের জবরদখল
জমিদারীটা ফিরিয়ে দিতে । অত্যাচারী হিসেবে, উৎপীড়ক হিসেবে
এমন যিনি দুর্ধর্ষ মানুষ, তাঁরই বংশে, ছেলে প্রাণকৃষ্ণের ঘর আলো
করে যে-নাতি এল, সে যেন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ । কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ যখন
কোলের ছেলে, দুধের শিশু, দাছু গঙ্গাগোবিন্দ আদর করে ডাকতেন,
লালা । হয়তো নাতির মুখে অবিরল লালা গড়াতে দেখেই এই
আদরের নাম । আবার কারো কারো মত, ভারতের উত্তর-পশ্চিমে
কায়স্থদের ডাকা হয়, লালা বলে । নামটা সেই কথাটাকেই মনে
রেখে । যাই হোক, কৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ লালাবাবু দেখতে দেখতে বীজ
থেকে চারা, চারা থেকে অজস্র ডালপালায় হয়ে উঠলেন পূর্ণ যুবা ।

শিখলেন আরবী, ফারসী, সংস্কৃত । শাস্ত্র বইয়ের সব শ্লোকই
বলতে গেলে মুখস্থ । ব্রাহ্মণ দেখলে মেতে ওঠেন আলোচনায় ।
খাঁচার ভিতর বন্দী পাখি দেখলে মন হয়ে যায় মেঘলা । যখন পারেন
তাদের উড়িয়ে দেন আকাশ আলো মেঘের দিকে, খাঁচার দরজা খুলে ।
ব্যবসা-বাণিজ্য, দেওয়ানিগিরিতে এক তিল মন নেই । মন তাহলে
কোথায় ? কেউ হৃদিশ পায় না । দাছু বুঝলেন, বিয়ে না দিলে এ
ছেলেকে সংসারী করা যাবে না । শুরু হয়ে গেল মেয়ে খোঁজাখুঁজি ।

পাওয়াও গেল একটি মেয়ে। বশেড়ার গৌরমোহন ঘোষের মেয়ে।
কাত্যায়নী। পরমা সুন্দরী। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। যেন ছিল কোন
মন্দিরের প্রতিমা। মস্তবলে মানুষ। প্রচুর আলো জালিয়ে, বাজি
পুড়িয়ে, বাজনা-বাঁজি বাজিয়ে, ব্রাহ্মণ খাইয়ে, কাঙালী বিদেয় করে,
গোলাপজল ছিটিয়ে, আতর ছড়িয়ে, বিয়ে হয়ে গেল। স্ত্রীর চান
কটা দিন মন দিলেন সংসারে। তারপরেই মারা গেলেন দাছ গঙ্গা-
গোবিন্দ। অমনি লালাবাবু ফিরে গেলেন নিজের আসল স্বভাবে।
মনের পাখি সংসারের খাঁচা ভেঙে উড়ে গেল সে-যেন কোনখানে।
বাবা বিরক্ত। মা বিরক্ত। বাবসায় মন নেই, বিষয়ে মন নেই, এ
ছেলে খাবে কি, পরবে কি?

নিজের চাকর একদিন এসে বললে,

—পরবার কাপড়খান ছিঁড়ে গেছে বাবু।

লালাবাবু এসেটের ম্যানেজারকে ডেকে বললেন,

—ওকে একটা নতুন কাপড় কিনে দেবেন।

কাপড় পেয়ে চাকর হতবাক। ছুটে এল প্রভুর কাছে।

—কাপড় দিয়েছেন দেখুন! হাঁটুও ঢাকে না।

লালাবাবু তাই দেখে রেগে লাল। তলব করলেন ম্যানেজারকে।

—আমার চাকরকে অমন খাটো মাপের কাপড় দিয়েছেন কেন?

—আজ্ঞে, কর্তার হুকুম।

—মানে, বাবা বলেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লালাবাবু বাবার কাছে হাজির। ছেলের অভিযোগ শুনে বাবার
গলায় কঠোর-কঠিন ভিরস্কার।

—তুমি বড় হয়েছ। কি করে বিষয় বাড়াতে হয় সেদিকে নজর
নেই। উপার্জনের ক্ষমতা নেই। তোমার গলায় এসব অভিযোগ
মানায় না। চাকর-বাকরদের যদি এর চেয়ে বেশী দিতে ইচ্ছে করে
নিজে রোজগার করে দাও গে।

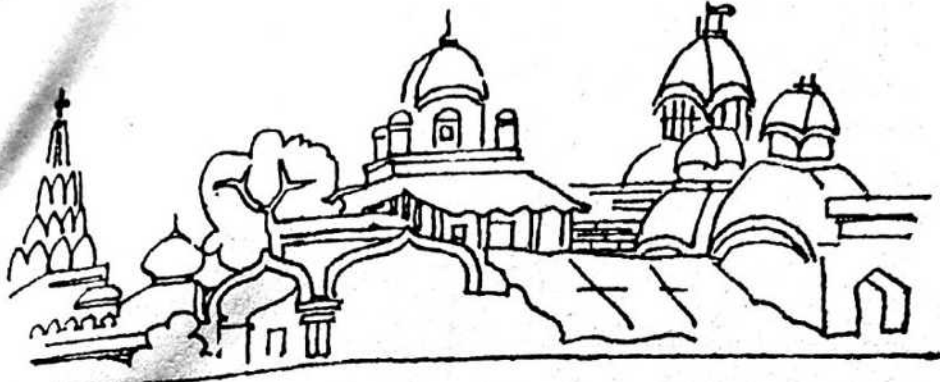
সারা গায়ে অপমান মেখে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। স্ত্রী

কাভায়নীর গা থেকে একটা সোনার গয়না খুলে নিয়ে বেচতে পাঠালেন দোকানে। সেই টাকায় নিজের চাকরকে সেইদিনই কিনে দিলেন লম্বা-চওড়া ধুতি। তারপরই বেরিয়ে পড়লেন সংসার ছেড়ে, ঠিক সেই যেমন করে রাজসুখ ছেড়ে, সোনার খাটের সাজানো বিছানা ছেড়ে, রূপসী স্ত্রীর ঘর-আলো-করা রূপের পিছটান ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারতবর্ষের বুদ্ধ, বাংলার নিমাই। লালাবাবুর বয়স তখন ১৭।

বাইরে এসেই চাকরী। প্রথমে সেরেসাদার, বর্ধমানের কালেকটর সাহেবের। সেই সময়েই কিনলেন বিশালাক্ষীপুরের জমিদারী। তারপর গভর্নমেন্ট তাঁকে পাঠিয়ে দিল উড়িষ্যায়, সেখানকার রাজস্ব বিভাগের কর্তা করে। সেখানেও কিনলেন কয়েকটা জমিদারী, এখন বেশ মন বসেছে বিষয়ে, অর্থ-সুখে। দেখতে দেখতে পা পড়ল ৩৩-এ। সেই সময় খবর এল, বাবা মৃত্যুশয্যায়। ছুটে গেলেন কান্দীতে। কিন্তু শেষ দেখা হল না। তার আগেই চিতার আগুন সব দিয়েছে ছাই করে। বুকে বাজল শোক। মনে বাজল বৈরাগ্য। দিলেন মহাসুখের সরকারী চাকরীতে ইস্তফা। চলে এলেন কলকাতায়। লোকে ভাবল, প্রচুর টাকার মালিক। এবার ওড়াবে বাঈজীর গান শুনে, নাচ দেখে, বাগান বাড়িতে ফুটি করে। কিন্তু লোকে দেখল, অশ্রু চেহারা। দিনরাত দান-ধ্যানে ব্যস্ত। দিনরাত শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সঙ্গে। এতবড় কলকাতা শহরে কারো সাথে মেশামেশা নেই। বন্ধু বলতে মাত্র একজনই। মহারাজা নবকৃষ্ণের ছেলে রাজা রাজকৃষ্ণ।

মনের ভিতর তলায় তখন একটা যাই যাই, পালাই পালাই রব। মোহ থেকে, মায়া থেকে, খাঁচা থেকে পালাতে হবে। তখন আছেন কান্দীতে। মাছ বেচতে এক জেলের মেয়ে এসেছে বাড়িতে। দেবী হচ্ছিল দাম দিতে। জেলের মেয়ে বলে উঠল, পারে বাবার বেলা গেল, তাড়াতাড়ি দাম দাও গো। যেন দৈববাণী, এমনভাবে কানে এসে পৌঁছল কথাটা। বেঁধে ফেললেন মন।

চোরবাগানের নীলমণি বস্তুর হাতে বিষয়-আশয়ের ভার ভুলে
 পা বাড়ালেন বৃন্দাবনের দিকে! কাত্যায়নীর গা-ভরা রূপ, বুক-
 ভালবাসা, চোখ-ভরা কান্নাও ধরে রাখতে পারল না তাঁকে। সঙ্গে
 ২৫ লক্ষ টাকা। আর কিছু নেই। বৃন্দাবনে পৌঁছেই শুরু করে
 দিলেন দিনরাতের দান-খ্যান। দু-দশদিনের মধ্যেই বৃন্দাবনের মানুষ
 জেনে গেল, এক দয়ালু এসেছে এখানে। অশ্রুদিকে একদল ডাকাত
 টের পেয়ে গেল, এই দয়ালু মানুষটা ধনী। একদিন চুরি হয়ে গেল
 ৩ লক্ষ টাকা। লালাবাবু বুঝলেন, আর দেবী নয়। সব খোঁজা
 যাবার আগেই গড়তে হবে মন্দিরটা। অশ্রুরোধ জানালেন রাজ-
 পুতানার রাণার কাছে মন্দির তৈরীর পাথরের জন্তে। রাণা রাজী।
 পাথর আসছে, মন্দির উঠছে। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ গড়ছে বর্ধমানের
 ভাস্কর কৃষ্ণচন্দ্র। এমন সময় ঘটে গেল এক দুর্ভোগ। রাজপুতানার
 রাণারা ইংরেজ সরকারের কী একটা ব্যাপারে সন্ধি করতে গররাজি।
 সরকার ভাবলেন, রাণাদের পরামর্শ দিয়েছে দেওয়ান লালাবাবু।
 চার্লস মেটকাফ তখন দিল্লীতে কোম্পানীর রেসিডেন্ট। তিনি হুকুম
 দিলেন, লালাবাবুকে ধরে আনবার। খবর শুনে সারা মথুরায়
 মানুষের চোখে জলে উঠল রাগের আগুন। লালাবাবুর সঙ্গে তারার
 চললেন দিল্লীর দিকে। যেন বন্দী করা হয়েছে তাদেরও। যত এগোল
 লালাবাবু, ক্রমশ তাঁকে ঘিরে বেড়ে ওঠে জনতা। একটা সামান্য
 মানুষকে ঘিরে ২০ হাজার মানুষের মিছিল। তখন মেটকাফ বুঝলেন
 নিজের ভুল। ক্ষমা চেয়ে নিলেন লালাবাবুর কাছে। তারপর
 রাজকীয় সম্মান। একমাসের মত সময় রয়ে গেলেন দিল্লীতে। দিল্লী
 থেকে আবার যেদিন পৌঁছলেন বৃন্দাবনে, সেদিন বৃন্দাবনের
 আকাশে, বাতাসে, মাঠে, প্রান্তরে, নদীতে, বনে, শুধু একটাই
 আওয়াজ—জয় লালাবাবুর জয়। সেই থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রয়ে
 গেলেন ঐ বৃন্দাবনেই। নিজের যা-কিছু সব দান করলেন মানুষকে।
 নিজেকে দান করলেন দেবতার পায়ে। কখনো বৃন্দাবনে গেলেন
 দেখতে পাবে লালাবাবুর তৈরী মন্দির। এখনো দেখবার মতো।



॥ পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্টি ॥

সব মানুষই স্বপ্ন দেখে। তোমরাও দেখো। আমরাও দেখি। নানা রকম স্বপ্ন। নানা রঙের। তার মধ্যে সব চেয়ে রঙীন স্বপ্নটা হল, বড়লোক হওয়ার। সকলেই বড়লোক হতে চায়। পাহাড়ের মতো উঁচু বাড়ি। হরিণের মতো ছুটন্ত গাড়ি। রূপোর বাসন, সোনার খাট, চাকর-বাকর, দাস-দাসি, শাড়ি-গয়না, সুখ-সুবিধে, যখন যা চাই, তখন তা হাতের কাছে। কিন্তু আজকের দিন-কালটা যেন কিপটে বুড়ো। কিছুতেই মুঠো খোলে না তার। জল গলে না হাতে। ফলে স্বপ্ন দেখে সকলেই। বড়লোক হয় মাত্র গোনা-গুনতি দু-চার জন। কিন্তু তোমরা কিংবা আমরা যদি দুশো বছর আগের পৃথিবীতে জন্মাতাম, বড়লোক হয়ে যেতে পারতাম কত সহজে। প্রবাদে আছে না, আঙুল ফুলে কলাগাছ, ঠিক তেমনি করেই। বিশ্বাস যদি না হয় তো শোনো, সেকালের বড়লোক হওয়ার বৃত্তান্ত।

বৈষ্ণবচরণ শেঠ কি করে বড়লোক হলেন? না, গঙ্গাজল বেচে। সারা ভারতবর্ষে চালান যায় বোতলে ভরা গঙ্গাজল। কোথায় অন্ধ্র প্রদেশ। তার ভিতরে তেলঙ্গানা রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজবাড়িতে সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের পূজা বন্ধ হয়ে যায় বৈষ্ণবচরণের গঙ্গাজল না পেলে।

নীড়িতরাম মাড়। বড়লোক হলেন কি করে? না, ক্রী দুজ দ্বিষ্ট
বাঁধ বেচে।

তারপর, কৃষ্ণপাস্তি। ছিলেন তো গরিবের ঘরের ছেলে। মাটির
হুঁড়ে, বড়ের চাল। অনাহার উপবাস নিত্যদিনের সাথী। সেই
কৃষ্ণপাস্তি কী করে কোটিপতি হলেন, সে এক রূপকথা।

বাবা সহস্ররাম। তিন ছেলে তাঁর। বড় কৃষ্ণচন্দ্র, মেজো
শত্ৰুচন্দ্র, ছোটো নিধিরাম। নিধিরাম জন্ম থেকে পঙ্গু। সহস্ররামের
ভরসা বলতে দুই ছেলে। পয়সা নেই যে লেখাপড়া শেখাবে তাদের।
তাঁর নিজের ব্যবসাতেই লাগিয়ে দিলেন দুই ছেলেকে। ব্যবসাটি কি?
না, পান বেচা।

গ্রামের নান রাণাঘাট। জেলা নদীয়া। সেই রাণাঘাট থেকে তিন
ক্রোশ দূরে গাংনাপুরে হাট বসে। সহস্ররাম পানের মোট মাথায়
হাটে যান। সঙ্গে থাকে দুই ছেলে। তাদেরও মাথায় মোট। হাটের
কাছে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি। সহস্ররাম সেই বাড়িতে পান জোগান
রোজ। ব্রাহ্মণ দেখলেন, কচি কচি ছোটো ছুথের ছেলে, রোদে পুড়ে,
বামে ভিক্ষে, না খেয়ে না দেয়ে, যেন গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো
হলুদ পাতা, এমন তাদের চেহারা। দয়া জাগে ব্রাহ্মণের মনে। তিনি
সহস্ররামকে জানিয়ে দিলেন, পান বেচা হয়ে গেলে যাবার সময়
আমার বাড়িতে খেয়ে যাবে রোজ।

কৃষ্ণপাস্তি সব পা দিয়েছেন কৈশোরে। হঠাৎ বাবা গেলেন
মারা। গোটা সংসারের ভার এসে পড়ল তাঁর একা। ঘাড়ে। তখন
শুধু হল শুধু এক হাটে একমাত্র পান বেচা নয়। নানান হাটে
নানান জিনিষ বেচা। কোনো হাটে পান। কোনো হাটে ছোলা।
কোনটায় গম, মটর, সরষে। এইভাবে কষ্টে-স্বপ্নে দিন কাটে। দেখতে
দেখতে বড় হয়ে উঠলেন সবাই। বিয়ে-থা হয়ে গেল সকলের।
সংসারে এল কচি কচি ছেলেমেয়ের ঝাঁক। কৃষ্ণপাস্তি মাথায় হাট
দিয়ে ভাবেন, সংসারের এই এত বড় নৌকোটাকে তিনি একা টেনে
নিয়ে যাবেন কী করে।

রাণাঘাটের গায়ে চূর্ণি নদী। একদিন স্নান করতে গেছেন। এক
 ব্রাহ্মণও স্নান করছিলেন সেখানে। নিজের স্নান সারা হলে কৃষ্ণপাস্তি
 ঘাটে উঠে দেখলেন, ব্রাহ্মণ নেই কিন্তু ঘাটের সিঁড়িতে পড়ে আছে
 একটা পুঁটলি। কৃষ্ণপাস্তি পুঁটলি খুলে ফেললেন, ভিতরে ১৫০টা টাকা,
 কয়েকটা রূপোর গয়না আর ধান তিনেক কাপড়। ব্রাহ্মণের পুঁটলি।
 ফেলে গেছেন ভুল করে। কৃষ্ণপাস্তি একটা বড়-সড় গাছের ছায়া বেছে
 নিয়ে পুঁটলিটাকে বুকে জড়িয়ে বসে রইলেন চুপচাপ। যতক্ষণ না
 ব্রাহ্মণের জিনিষ ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিতে পারছেন, আহার-নিদ্রা
 সব বন্ধ। আলো-জ্বালানো সকাল গেল, রোদে-পোড়ানো দুপুর গেল,
 আকাশ-রাঙানো গোধূলি গেল। তখন পৃথিবী জুড়ে নেমে এল সন্ধ্যা,
 যেন পাড়াগাঁয়ের গরীবের ঘরের কালো চোখের, কালো চুলের,
 কালো রঙের কিশোরী মেয়ে, সাঁঝ-প্রদীপের মিটমিটে আলোর মতো
 আকাশের এদিকে-ওদিকে, একোণে-ওকোণে এলোমেলো কয়েকটা
 নক্ষত্র ফুটিয়ে। ঘনিয়ে এল গাঢ় অন্ধকার। নিশুত রাতের গাছের
 ডালে পেঁচার মুখে ফুটে উঠল গা-চমকানো বোল। বন-বাদাড়ে
 বেরিয়ে পড়ল সাপখোপ, জন্তু-জানোয়ারের দল যে-যার নিজের নখ-
 দাঁত নিয়ে। আর চারপাশের এইসব ভয়ানক দৃশ্য আর ভয়াবহ
 অন্ধকারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ঝোপঝাড়ে হাজার
 হাজার ঝিঁঝি পোকা তারতরুে আর্তনাদ করে চলল তাদের কচি
 গলায়। আর ঠিক সেই সময়ে, কৃষ্ণপাস্তি দেখতে পেল ব্রাহ্মণকে।
 দিশেহারা হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্নানের ঘাটের
 সিঁড়ির ধাপে ধাপে। কৃষ্ণপাস্তি এগিয়ে এলেন তাঁর সামনে।
 ব্রাহ্মণের হারানো জিনিষ তুলে দিলেন ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ
 পুঁটলি খুলে দেখলেন, যা ছিল সবই আছে। আনন্দে নেমে এল
 জলের ধারা ছটো চোখে। প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন কৃষ্ণপাস্তিকে
 —যদি ভগবান থাকেন, তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য দেবেন।
 কৃষ্ণপাস্তি ভাবেন, তাই কখনো হয়! পান বেচে খাই, আমি
 হবো বড়লোক!

কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র । আড়ংঘাটায় তাঁর 'যুগল কিশোর'
মন্দির । মোহান্তের নাম, গৌসাই গঙ্গারাম । কৃষ্ণপাস্তি পান
যোগাতেন সেই গৌসাই-এর বাড়িতে । একদিন কৃষ্ণপাস্তি এসে
আছড়ে পড়লেন গৌসাই-এর পায়ে । হ'চোখে জল । হ'হাতে
প্রার্থনা ।

—কি হয়েছে কৃষ্ণ ?

—প্রভু, আজ আমার গুরুঠাকুর আমাকে অপমান করে
তাড়িয়ে দিয়েছেন ।

—কেন ?

—গুরুঠাকুরের মায়ের ছান্দো । আমার নেমোস্তর ছিল । গরিব
মানুষ । কি নিয়ে যাই । নিয়ে গেছলুম এক সরা হুন । হুন দেখে
গুরুঠাকুর রেগে যেন অগ্নিশর্মা । বললেন, ছান্দোর পানগুলোও দিতে
পারলি না ? দূর হ পাঞ্জি বেটা ! খেতে পর্যন্ত দিলেন না । তাড়িয়ে
দিলেন ।

—ঠিক আছে, বিশ্বাস কর । ভোগের প্রসাদ খা । আমি ব্যবস্থা
করছি ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ, মোহান্ত এসে বললেন

—মন্দিরের ভোগের জন্তে ছোলা কেনা আছে হুটো গোলা
বোকাই করে । কিন্তু ছোলাগুলো শুরু করেছে পচতে । তুই
নিরে নে ঐ হু-গোলা ছোলা । বেচে-টেচে যা পাবি, তার থেকে
গোবিন্দজীর একদিনের ভোগের খরচ বাবদ দিবি কেবল নয় টাকা জের
আনা ।

কৃষ্ণপাস্তি রাজী । গোলার হুকে দেখলেন উপর তলার সমস্ত
ছোলাই পচা । হুগন্ধ আসছে নাকে । কিন্তু উপরের পচা ছোলা-
গুলোকে সরাতে-সরাতেই বেরিয়ে পড়ল ভিতরকার ভাল ছোলা ।
ঝোড়-বেছে হুটো গোলা থেকে কৃষ্ণপাস্তি পেয়ে গেলেন সাত আট
হাজার মণ টাটকা ছোলা ।

১৭৮০ । কলকাতা শহরে তখন ছোলার আকাল । খবর ছড়িয়ে

পড়ে কলকাতার ব্যবসায়ীদের কাছে, আড়ংঘাটায় কৃষ্ণপাস্তির কাছে
রয়েছে হাজার হাজার মন ছোলা। ছুটে এল ব্যবসায়ীরা ছৌ-মারা
চিল্লির মতো এক দৌড়ে। দু-তিন দিনের মধ্যে খালি হয়ে গেল কৃষ্ণ-
পাস্তির ছোলার গোলা ছুটে। লাভ হয়ে গেল কৃষ্ণপাস্তির বারো-
তেরো হাজারের মতো টাকা। এ যেন দৈবযোগে পাওয়া। কৃষ্ণপাস্তির
মনে পড়ে গেল, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ।

হাতে অনেক টাকা। আর দারিদ্র্য নেই সংসারে। সবার মুখে
হাসি। সবার মনে সুখ। কৃষ্ণপাস্তি গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন
কলকাতায়। জমি কিনে হাটখোলায় খুললেন বড়-সড় মাপের একটা
আড়ত। শুরু করলেন ঘূনের ব্যবসা। তাতে টাকার তোড়া আসতো
জলের তোড়ের মতো। ব্যবসায়ী হিসেবে সারা কলকাতায় নাম
ছড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণপাস্তির। লোকে বলতে লাগল, হাটখোলার
কর্তাবাবু। মান-সম্মান শুধু বাঙালী বা ব্যবসায়ীদের কাছেই নয়।
সাহেবসুবোধের কাছেও সমান সমাদর। সল্ট বোর্ডের যিনি হর্তা-কর্তা,
সেই সাহেবের কাছে কৃষ্ণপাস্তির এমন কদর যে, তিনি হাজির না
থাকলে ঘূনের নিলাম ডাকা হয় না। কৃষ্ণপাস্তির বসবার চেয়ার বোর্ডের
সেক্রেটারির পাশে। কৃষ্ণপাস্তির যশ, অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে
অনেক বড় বড় জমিদারদের মনে জ্বালা, চোখে রাগ, দাঁতে হিংসে।
তিলির ছেলে। পরনে তো চিট-ময়লা আট হাত কাপড়। গায়ের রঙ
যেন কাঠ-কয়লা। পেটে নেই বিস্ত্র। সে হয়েছে লাট সাহেব।
কৃষ্ণপাস্তি তখন রাণাঘাটের প্রায় সমস্ত জায়গা-জমি কিনে চলেছেন
একে-একে। তাই দেখে অল্প সব জমিদাররা ছুটে আসেন জমির
নিলাম ডাকতে, কৃষ্ণপাস্তিকে হারিয়ে দেবার মতো দর-দাম হেঁকে।
কৃষ্ণপাস্তি সেটা চের পেয়ে যাবার পর একদিন রেভিনিউ বোর্ডের
অধ্যক্ষকে জানিয়ে দিলেন, যে যত ডাক দেবে, তার উপর এক হাজার
টাকা বেশী দেওয়া রইল। শুনে জমিদারদের উঁচু মাথাগুলো ঘুরে
পড়ল মাটির দিকে, যেন বড়ের হাতে মার খাওয়া উঁচু গাছের ডাল।
কৃষ্ণপাস্তি ব্যবসা নিয়ে থাকেন কলকাতায়। মাসে মাসে টাকা

পাঠান ভাই শব্দর কাছে। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যোল বছরের মধ্যে দেশে ফিরবেন না। যোল বছর পরে দেশে গিয়ে দেখেন, কোথায় তার সেই চালাঘর, মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি। তার জায়গায় বিরাট পাকা বাড়ি। নিজের পিতৃপুরুষের বাড়ি দেখতে না পেয়ে তার তখন পাগলের মতো অবস্থা। পাড়াপ্রতিবেশীদের শুধোন

—হ্যাঁগো বাবু, ইথেনে পাস্তিদের বাড়িটা কোথায় ?

তারা দেখিয়ে দেয় সামনের একাও অট্টালিকা।

—ঐ যে গো। সে কুঁড়েঘর আর নেই। পাস্তিরা এখন মহাকনী। অট্টালিকায় ঢুকে কুকপাস্তি হাঁক দেন।

—হ্যাঁগো, শেখো ঘরে আছে ?

ছুটে আসে শেখো অর্থাৎ শব্দু। দাদাকে চিনতে পারে নি। চিনতে পেরে পায়ে লুটিয়ে প্রণাম। শব্দু বলে

—হঠাৎ না বলে-কয়ে চলে এলে যে ? সব মজল তো ?

—হ্যাঁ। সব মজল।

—কিন্তু শেখো, তুই যে আজার মতো বাড়ি করি, তা আমাকে একবার বলিনি। বাড়ি করেছিস, বাগান করেছিস, গোলাবাড়ি করেছিস, গোশালা, ঘোড়াশালা সবই করেছিস দেখছি। কিন্তু ঠাকুর ঘর কই ? হিংস্র ছেলে ঠাকুর ঘর করি নি ! ঠাকুর পিতিষ্ঠে ন হলে আমি তো এ বাড়িতে জল গেরণ করব নি।

কুকপাস্তির কথাও যা, কাজও তাই। নিজের অট্টালিকা হো আজায় নিলেন পাশের এক গরীব ব্রাহ্মণের বাড়িতে। শব্দু ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার পর তবে ঢুকলেন নিজের বাড়িতে।

আগেই শুনেছো কুকপাস্তির বর্ণপরিচয়ও হয়নি কোনোদিন। তাই শেষ বয়স পর্বস্তু তার উচ্চারণে রয়ে গিয়েছিল আম্য টান। তা উপরে ছিল উচ্চারণের দোষ। বুড়ো বয়সেও আড় ভাঙেনি নিজের তাই শব্দু হয়েছিল, শেখো। রাজাকে বলতেন আজা। এবার শোনো তার দান-খ্যানের বছর।

একবার কৃষ্ণপাস্তি কলকাতা থেকে নৌকায় চেপে চলেছেন
রাণাঘাটে। মাঝপথে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার ছায়া। জল-স্থল একাকার।
এমন সময়ে ডাকাত পড়ল নৌকায়। কৃষ্ণপাস্তি ডাকাত সর্দারকে
বললেন

—ওরে আমি কৃষ্ণপাস্তি। এখন আমার ঠাই কিছু নাই। পরন্তু
গদিতে যাস। তোদের খুশি করবো।

ডাকাত-সর্দার বললে

—কর্তামশাই, তখন গেলে তো ধরিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণপাস্তির চোখে মুখে লজ্জা।

—বলিস কি রে? কৃষ্ণপাস্তি কি নেমকহারাম?

রাণাঘাট থেকে কৃষ্ণপাস্তি ফিরে এলেন কলকাতায়। যথা সময়ে
তার গদিতে জনা দশেক ডাকাত তাদের সর্দার সহ হাজির। কৃষ্ণপাস্তি
হুকুম দিলেন—এদের প্রত্যেককে এক এক হাজার টাকা করে
দিয়ে দাও।

তাই শব্দে শুনতে পেয়ে রেগে অগ্নিশর্মা।

—টাকা দেবে কি? এখুনি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দাও। ওরা খুনে
ডাকাত।

কৃষ্ণপাস্তির মুখে ককণার আলো।

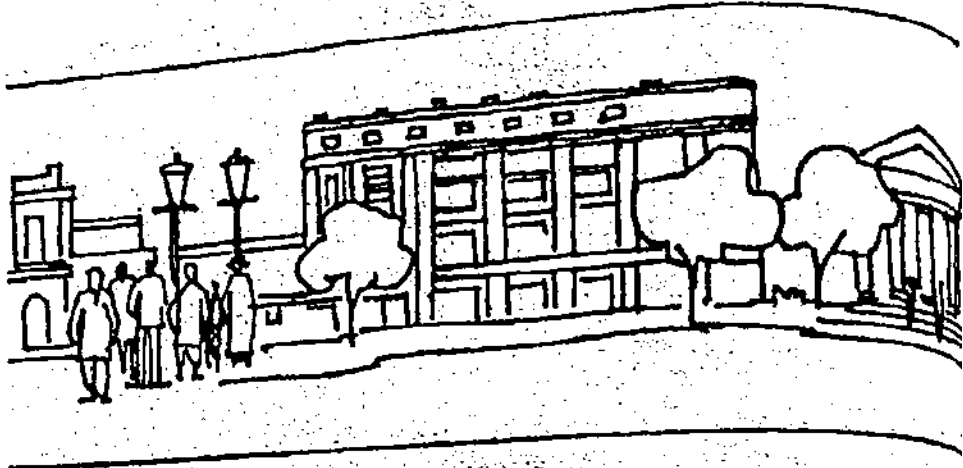
—তোর অত ভাবনা কেন? ওরা খাতি পেলে আর ডাকাতি
করবে না।

কৃষ্ণপাস্তি তাদের প্রত্যেককে এক হাজার করে টাকা দিয়ে
বললেন

—ব্যবসা কর গে। আর ডাকাতগিরি করো না।

ডাকাতরা চোখের জলে ধুইয়ে দিলে কৃষ্ণপাস্তির পা। এরকম
উদারতার ঘটনা এক-আধটা নয়, অগুণতি। কৃষ্ণনগরের রাজারা তাঁর
কাছ থেকে উপকার পেয়েছিল বহুবার। তাই রাজা শিবচন্দ্র উপাধি
দিয়েছিলেন ‘চৌধুরী’। ইংরেজরা চেয়েছিল ‘রাজা’ উপাধি দিতে,
নেননি। কলকাতার জনসাধারণ ভালবেসে উপাধি দিয়েছিল,

মানবীর। কৃষ্ণপাস্তুর খ্যাতি খোদাই করা আছে—সাধক কবি
কমলকান্তর এক গানে—
“ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপাস্তি
তারে দিলি জমিদারী।”



॥ নাটুকে রামনারায়ণ ॥

বাংলাভাষায় যার কলমে প্রথম নাটক, তাঁর নাম এখন আর
অজানা নেই কারো। যে-নাটক লিখে রামনারায়ণ তর্করত্নের ঐ
সম্মান-সমাদর, তার নাম ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’। একবার তাঁর লেখা
‘রত্নাবলী’ নাটকের অভিনয় হচ্ছে বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার
রাজবাড়িতে। ‘রত্নাবলী’ অবশ্য অহুবাদ, ত্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটকের।
অভিনয়ের আগে মহড়া চলছে যখন, তখনই বাতাসের পিঠে চেপে
উত্তর ডিঙিয়ে ধবরটা ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণের সাহেব-পাড়ায়। সঙ্গে
সঙ্গে বেশ কিছু জাঁদরেল সাহেব-সুবোর অহুরোধ, আমরাও নাটকটা
দেখতে উৎসাহী। সাহেবরা ডগোমগো, ভাল কথা। কিন্তু নাটক
দেখে বুঝবে কী? বোঝাতে গেলে ইংরেজিতে অহুবাদ করাতে হয়।
সেখানেও সমস্যা। হাতে নেই সময়। সামনে নেই অহুবাদক।
কথাটা কানে যেতেই গৌরদাস বসাক বললেন, কে বললে নেই।
কেন, মাইকেল? সেই বছরই মাইকেল মধুসূদন মাকাজের একটানা
সাত বছরের চাকরি-জীবনে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায়। প্রিয়বন্ধু

অহরোধে মাইকেলের মুখে তখন—হাঁ।। সাহেবদের কথা মনে রেখেই খাঁটি স্তাকসানি ইংরেজিতে ঝড়ের বেগে অনুবাদ করে দিলেন সে-নাটক। পাইকপাড়ার রাজবাড়ির দুই রাজা এবং দুই ভাই প্রতাপচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁদের ম্যানেজার রাম চট্টোপাধ্যায়ের মারফত যৎসামান্য সম্মানসূচী হিসেবে মাইকেলকে উপহার পাঠালেন পাঁচশো টাকার চেক। যথাসময়ে অভিযানের তৃতীয় দিনে কলকাতার সাহেবরা গাড়ি-ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এলেন নাটক দেখতে। নাটক দেখে তাঁরা ডাবল খুশি। প্রথম খুশি, অভিনয়ে। দ্বিতীয় খুশি, অনুবাদে। মাইকেল মধুসূদনের জয়জয়কার। ঘটনাটা এই পর্যন্ত পৌঁছে যেমে গেলে, ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এমন কিছু মান-মর্যাদা পেত না হয়তো। কিন্তু ‘রক্তাবলী’ নাটকের অভিনয় বাংলা সাহিত্যে ডেকে আনল এক নতুন জোয়ার। অনুবাদের কাজে জড়িয়ে মাইকেল মধুসূদনের শুকনো মনে হঠাৎ এক বসন্তের হাওয়া। সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধান্ত, নাটক লিখতে হবে। দীপাবলীর রাতের কালো আকাশে যেমন করে একের পর এক ফুটে চলে রঙিন আলোর ফুলকি-ছড়ানো বাজি, বাংলা সাহিত্যের নাটক-হীন আকাশে মাইকেল এরপর তেমনি করেই ফুটিয়ে চললেন রঙিন আলোর বলকানি, নাটকে প্রহসনে। ‘শর্মিষ্ঠা’র পর ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ তারপর ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’। তারপর ‘পদ্মাবতী’, ‘কৃষ্ণকুমারী’ ইত্যাদি।

আমাদের গল্প অবশ্য মাইকেলকে নিয়ে নয়, রামনারায়ণকে নিয়ে। আবার ঠিক রামনারায়ণকে নিয়ে নয়, তাঁর নাটককে নিয়ে। আসল কথা, নাটক নিয়েও নয়, নাটকের নটী নিয়ে। নাটক অভিনয় করতে গেলেই রামনারায়ণের সামনে হাজির হয় ঐ একটিই মহাসমস্তা, নটী-সমস্তা। নিজের গ্রাম হরিনাভিতে নিজের লেখা প্রথম নাটকের অভিনয়। স্টেজ বাঁধা হয়েছে। তিন দিক বন্ধ, একদিক খোলা। কিন্তু থিয়েটার বস্তুটা গ্রামের মাহুঘের রপ্ত হয়নি তখনো। অভিনয় মানেই বাজা। ফলে স্টেজের চারপাশ ঘিরেই থিকুথিকে ভিড়। রামনারায়ণ

টেটিয়ে হান্নাক : আপনারা সকলে দয়া করে স্টেজের খোলা দিকটার সামনে এসে বসুন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। নাটক শুরু হবার আগে অবস্থা যখন এইরকম নাটকীয়, তখন গ্রিনরুমে মহড়া চলেছে বড় মাপের এক অতি নাটকীয় ঘটনার। পরামানিকের হাতে বক বকে সস্তা খান দেওয়া একটা খোলা ক্ষুর। আর সেই উন্মত্ত ক্ষুর নিয়ে তার ঘুরপাক রমনী-সাজে-সাজা একটি ছেলের পিছু পিছু।

নাটক আরম্ভের প্রথম কনসার্ট শুরু। দ্বিতীয়বার বাজলেই পর্দা উঠবে। এই রকম শিরে-সংক্রান্তির মুহূর্তে গ্রিনরুম থেকে হস্তদত্ত একজন ছুটে এল রামনারায়ণের কাছে।

—আপনি ভিতরে চলুন শিগ্গির।

—কেন, কী হয়েছে?

—যে নটী সেজেছে, সে কিছুতেই গৌফ কামাতে চাইছে না।

গ্রিনরুমে এসে বালকটির প্রতি রামনারায়ণের বিব্রত প্রশ্ন

—গৌফ কামাচ্ছ না কেন?

—মাপ করবেন, গৌফ কামাতে পারব না।

—কেন, কেন?

—বৌ বলেছে, মেয়ে সাজছ সাজো। কিন্তু গৌফ কামাবে তো আমার মরামুখ দেখবে।

রামনারায়ণ একগলা জলে। ছেলেটির তো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। এখন নাটক হয় কী করে! মাথা চুলকে, ভুরু কুঁচকে, ভাবতে লাগলেন উদ্ধারের রাস্তা। রাগ করে ছেলেটিকে যে বাদ দেবেন, সে গুড়েও বাগি। কারণ ছেলেটির গসায় মধু। গান ধরলেই আশ্রয় মাত। ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির বিহীন চমকাল মগজে। একটা ক্রমাল নিয়ে কোনাকুনি পাকিয়ে মাঝখানে স্তোত্র বোঝে। নটী-সাজে-সাজা ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন

—বর্তমান স্টেজে থাকবি, মুখের সামনে ঘোরাবি। থামবি না একবারও।

এইভাবেই সে-বাজা রন্ধে পাওয়া।

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে হচ্ছে 'নব নাটক' এর অভিনয়। পর পর ন'দিন। ঠাকুরবাড়ির পাশের বাড়িতে থাকেন এক গাট্টো মশাই। তিনি হঠাৎ রোগে কঁাই। ছিঃ ছিঃ, এ কী অলক্ষ্যে কাণ্ড-কারখানা! বাড়ির মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে। আর তো মান থাকে না। বলে এসো তো ও-বাড়িতে গিয়ে। তাঁকে যত বোঝানো হয় যে, ওরা মেয়ে নয়, সাজা-মেয়ে, আমাদের জ্যোতি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মেয়ে সেজেছেন আসল হিরে-মানিকের গয়না পরে, তবু তাঁর অবিশ্বাস ঘুচবার নয় কিছুতেই। রাগে তিনি বাঘের মতো গরগরে।

অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইখানায় আরও অনেক মজার-খবর এই নাটক নিয়ে। এই নটী নিয়ে আরেক দিন আর এক কাণ্ড। নাটক দেখে বেইলি সাহেবের মন খুশিতে টইটবুর। নাট্যকার এবং অভিনেতাদের অভিনন্দন জানাতে ছুটে এসেছেন তিনি গ্রিনরুমে। ঘরে ঢুকেই এক মহিলাকে পিয়ানো বাজাতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে দে পিট্টান।

—সুরি, সুরি, জেনানা রয়েছে ভিতরে, জানতুম না।

কোথায় জেনানা? ও তো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ!

'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে নিয়ে বিপদ শুধু বাইরে নয়, ঘরেও। ঐ নাটকের এক জায়গায় ফলারের বর্ণনা আছে তিন রকম—উত্তম, মধ্যম আর অধম। উত্তম ফলারের বর্ণনার প্রথম ছোটো পঙ্ক্তি ছিল—

'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু-চারি আদার কুঁচি
কচুরি তাহাতে খান দুই!'

একদিন এক বাড়িতে এই উত্তম-ফলারের নিমন্ত্রণ। রামনারায়ণের ভাগ্নে বিরাজমোহন। ম্যালেরিয়ার অষ্টোপাশ সাতপাকে জড়িয়েছিল তাকে। এখন ম্যালেরিয়া ছেড়েছে, কিন্তু পিলে ছাড়েনি। পেটটা কোলবালিশের কিংবা কোলা ব্যাণ্ডের মতো ফোলা। এমন অবস্থায় ঘিয়ে-ভাজা লুচি বিষবৎ। অথচ ভাগ্নেটি নেমস্তন্ন খেতে যাবেই। অবশেষে নাছোড়বান্দা ভাগ্নের প্রতি মামার সতর্কবাণী

‘নেমন্তুনে যাচ্ছিস যা। কিন্তু আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে
লুচি খাবিনি।’

ভাগ্নেটি প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং রেখেছিলও। সে লুচি খায়নি।
তার বদলে মাত্র একচল্লিশটা কচুরি। কচুরির তাগুবে পিলে বোধহয়
চম্কে গিয়েছিল তার। কেননা ম্যালেরিয়া তার ধার-কাছ দিয়ে
হাঁটেনি আর।

**Click Here For
More Books>>**



কি করে কলকাতা হলো, ছড়ায় মোড়া
 কলকাতা, কলকাতার রাজকাহিনী,
 কলকাতার প্রথম, পুরনো কলকাতার
 পড়াশোনা। ছোটদের জন্যে কলকাতাকে
 নিয়েই পূর্ণেন্দু পত্রী লেখা এই সব
 বইগুলোর প্রত্যেকটিই স্বাদে-গন্ধে
 আলাদা। কিন্তু প্রত্যেকটিতেই
 অতীতকালের কলকাতা ফুটে উঠেছে
 যেন কলমে আঁকা ছবির মতই। পড়তে
 পড়তে ছোটদের মনে হবে তারা যেন
 ফিরে গেছে দু-শতক আগের কলকাতায়।
 তাঁর এই নতুন বইটিতে মজার সব গল্প
 আদ্যিকালের কলকাতার নামডাকওয়ালা
 মানুষদের নিয়ে। অক্ষরে অক্ষরে যেন
 এক আজব শহরের অবিশ্বাস্য রূপকথা।